কদম

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা বারো

প্রথম সংস্করণ : চৈত্র, ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ ; চৈত্র, ১৮৭৯ শকাব্দ

প্রকাশক : শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট,

কলিকাতা—১২

মুদ্রাকর : শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

মানসী প্রেস

৭৩, মানিকতলা স্ট্রীট,

কলিকাতা—৬

প্রচ্ছদপট-শিল্পী :

খালেদ চৌধুরী

ব্লক ও প্রচ্ছদপট-মুদ্রণ :

ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও

বাঁধাই : বেঙ্গল বাইণ্ডার্স

আড়াই টাকা

উৎসর্গ

শ্রীযুক্ত বিশু মুখোপাধ্যায়,

প্রিয়বরেষু

ব. ভ. ম.

এক

রামকানাই এসে কাঁচুমাচু হয়ে দাঁড়াল; মাথাটি নীচু, একদিকে একটু হেলানো, একটি হাতের মুঠোর মধ্যে আর-একটি হাতের মুঠো আবদ্ধ, মুখে করুণাপ্রার্থী অপরাধীর হাসি একটু। বিরক্ত হয়ে বললাম—"না, আর ছুটি আমি দিতে পারব না, কোনমতেই নয়। এই কমাসে কদিন ছুটি হল হিসাব রেখেছ তার? আমার কাজ চলে কি করে এদিকে?"

একভাবে দাঁড়িয়েই রইল।

বললাম—"না, হবে না, যাও। একা মানুষ, জান তো চাকর-বাকরই আমার হাত-পা। একটা না একটা একটা ছুতো করে ক্রমাগত যদি ছুটিই নিতে থাক তো রাখা কেন তোমায়?…তা বেশ, যাও, আমিও অন্য লোক দেখি।"

কথা কইল, বলল—"আর ছুটি প্রয়োজন হবে না বাবু।"

"তার মানে?"

"নিয়েই আসব এবার। সেই কারণেই যেতে বলেছে।"

"বটে! এখানে নিয়ে আসবে? একটা রুগী মানুষ, মাসের মধ্যে বার বার করে গিয়ে তদারক করে আসতে হচ্ছে তোমায়; তবু, যেমন শুনি, সেখানে দেখবার লোক রয়েছে। এখানে তো তাকে নিয়েই পড়ে থাকতে হবে তোমায়। তারপর?…"

বিস্মিত হয়ে চুপ করে যেতে হল, রামকানাই ছোট্ট কোঁচার-খুঁটটা তুলে চোখ মুছছে, বার দুই চাপা কান্নার কোঁস-ফোঁস শব্দও হল।

বিরক্ত হয়েই প্রশ্ন করলাম—"কাঁদো যে! সাদা কথায় আর কাজ হচ্ছে না বলে বুঝি?"

"না নিয়ে এলে আত্মহত্যে হবে বলেছে বাবু।…এতদিন একত্রো ঘর করলুম…"

"হোক আত্মহত্যে। না হয়, বলছিই তো কাজ ছেড়ে একত্র ঘরই করোগে। রোজ একটা না একটা মিছে বাহানা,—এরকম করে কাজ করা চলে না বাপু।… যাও!"

ঘুরে আবার অফিসের কাগজ নিয়ে পড়লাম।

একটু পরে খুসখুস একটা আওয়াজ হতে ঘুরে দেখি আবার এসে দাঁড়িয়েছে। হাতে একটা গোলাপী-খাম, তার মধ্যে থেকে একটা চিঠি অর্ধেকটা টেনে যে বের করেছে শব্দটুকু ছিল তারই।

প্রশ্ন করলাম—"চিঠি!… কার চিঠি?"

"এই লিকেছে বাবু।…বললেন মিচে বাহানা করছি, তাই মনে করলুম…"

উচিত যে হয় নি সেটা পরে হুঁশ হল। বিস্ময়ে যেন হতবুদ্ধি হয়ে হাতটা বাড়িয়ে চিঠিটা নিলাম, আগাগোড়া পড়েও গেলাম। খামের মত এর রংটাও গোলাপী, ওপরে ডানদিকের কোণে একটা ফুটন্ত গোলাপ ফুলের ওপর একটা প্রজাপতি। এক জায়গায় একটু ফুলেল তেল বা এসেন্সের ছোপ, গন্ধ তখনও একটু একটু লেগে রয়েছে। চোখ দুটো যেন অবাধ্যভাবেই আমার প্রৌঢ় ভৃত্য রামকানাইয়ের ওপর গিয়ে পড়ল। চিঠিতে লেখা রয়েছে—

জীবিতেশ—

আমার শরীর খুবই খারাপ; কিন্তু ইহার জন্য আমার এতটুকুও খেদ নেই। কারণ এ বিচ্ছেদ-যাতনা আমার আর একেবারে সহ্য হইতেছে না; মরণ হইলেই বাঁচি। তুমি প্রভুর কর্ম ক্ষতি করিয়া মাঝে মাঝে আসিয়া (আমার মনে হয় যেন কত যুগ) আমায় যে দর্শন দিয়া যাও তাহাতে মৃত্যুর দিনটা পিছাইয়া যায় মাত্র। প্রভুর অভিশাপে কিন্তু আমি দিন দিনই সেই পরম আকাঙ্ক্ষিত মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইতেছি। আমায় যত্ন করিয়া ঔষধাদি দিয়া যাও, কিন্তু তাহাতে কি ফল নাথ? আমার এ বিচ্ছেদ-জ্বালা যে আর সহ্য হইতেছে না। সেই কারণ লিখি যদি আমায় অবিলম্বে আসিয়া না লইয়া যাও তো মরণ দয়া না করিলে আমাকে

আপনিই বুঝি মরণকে বরণ করিতে হয়। অতএব যাহা ভালো বিবেচনা হয় করিও। শ্রীচরণে প্রণাম।

ইতি

দাসী

চিরদুখিনী কদম।

পুনশ্চ।

ঔষধ কোন আনিও না আর, মাথার দিব্য রহিল। তোমার চন্দ্রবদনই যে আমার ঔষধের সেরা ঔষধ প্রাণাধিক।

ইতি।

চন্দ্রবদনের দিকে চোখ তুলে চাইলাম; কোন্ কথাটা আগে জিজ্ঞাসা করব যেন সেই খুঁজে পাচ্ছি না।

পড়তে পারে কি না জিজ্ঞাসা করতে গিয়ে মনে পড়ল অবসরকালে মাঝে মাঝে রামায়ণ পড়তে শুনেছি; চিঠির লেখাটাও প্রায় ছাপার মতো। প্রশ্ন করলাম—"মানেটা সব বুঝেছ?"

কাঁচুমাচু হয়েই বলল—"আজ্ঞে না, তাইতেই তো আরও ভয়, ভেতরে কী অর্থ আছে, কী করতে কী করে বসবে…"

প্রশ্ন করলাম—"তোমার পরিবার লেখাপড়া জানে?"

"কিছু কিছু বাবু, শহরেই মানুষ হয়েছেল তো।"

" 'কিছু কিছু'! তা, এ চিঠি ওকে কে লিখে দিয়েছে…জান তুমি?"

"আজ্ঞে, দিদিমণি।"

"দিদিমণিটি কে?"

"আজ্ঞে আমাদের গাঁয়ের জমিদার ব্রজবল্লভ বাবুর কন্যে। এ তানাদের বাড়িতেই কাজ করছে তো। আর দিদিমণিরই পেদমতে বেশী থাকে কি না।"

একটু গুছিয়ে ভেবে নিলাম।

"বিয়ে-থা হয় নি দিদিমণির? গাঁয়েই থাকে বলছ…ছেলেমানুষ বুঝি এখনও?"

"আজ্ঞে, ছেলেমানুষই, আমাদের নজরে তাই। এই তো সিদিন মায়ের

কোলে এল। তবে, বিয়ে হয়েচে বৈকি ; জমিদার-ঘরের মেয়ে, পড়ে থাকবে ? বিয়ে হয়েছে এই আশ্বিনে পুরো দু-সন হবে।"

"তা শ্বশুরবাড়ি যায় না মেয়ে ?···তোমার পরিবার গাঁয়ে থেকেই সেবা করে বলছ কি না···"

"আজ্ঞে, ঐখানে একটু গোল বেধেছে। রায়মশাইয়ের ঐ একটি কন্তে—মেয়ে বলুন, ছেলে বলুন, ঐ দিদিমণি। তানার ইচ্ছেটা জামাই এসে এখেনেই থাকুক। তাই যদি মতলব তো দেখেশুনে করা উচিত ছেল ; শ্বশুড়বাড়িতে পড়ে থাকবার মতন জামাই যে ভূভারতে নেই এমন তো নয়। তা না করে রায়মশাই এক বিলেত-ফেরত জামাই করতে গেলেন। এখন তানার পেটে বিলেতের কড়া জল ঢুকেচে—আসেন না যে এমন নয়, আসেন, তবে সে কদ্চি-কখনও ; কয়েমী হয়ে বসোবাস করা, তাতে রাজী নয়। ইদিকে রায়মশাইও জিদ ধরেছেন মেয়ে পাঠাব না,—এই নিয়ে···"

"দেখি তো আর একবার।"—চিঠিটা চেয়ে নিয়ে বেশ নিঃসঙ্কোচেই পড়ে গেলাম ; এবার যা পড়ছি তা একটা নভেলেরই ভগ্নাংশ তো। কি মনে হল, হয়তো নভেলটা পুরো করে নেওয়ার লোভই ; অবান্তর হলেও জিগ্যেস করলাম—"কি মনে হয়, এই রকমই চলবে—মেয়ে এক জায়গায় জামাই এক জায়গায় ?"

"আজ্ঞে, তা কখনও চলে ? অগাধ সম্পত্তি রায়মশাইয়ের। তবে ঐ উদিকে বিলেতের জলটুকু শরীল থেকে বেইরে না গেলে···"

"বেশ, যাবে তো যাও, নিয়ে এসোগে, ছুটি দিতে দিতে তো আমি জেরবার হয়ে যাচ্ছি।"

—ভাবলাম, বেচিলার মানুষ, চিঠির মধ্যে কতখানি সত্য-মিথ্যা তা বুঝতে যাওয়ার দরকারই বা কি, আর পারবই বা কেন আমি ? মাঝে পড়ে লোকের শাপমন্যি কুড়নো।

হাসিটা আরও স্পষ্ট করে, মুখটা আরও নীচু করে হাত কচলাতে কচলাতে রামকানাই চলে গেল।

সন্ধ্যার সময় অলসভাবে বেড়াতে বেড়াতে বাসার হাথার শেষ প্রান্তে আউট-হাউসটার দিকে গিয়ে দেখি ঘরের দোরটা খোলা আর ভেতরে আলো জ্বলছে। রামকানাইয়ের তো চলে যাওয়ার কথা, তবে ঘরে আলো জ্বলে কেন? কৌতূহল হতে এগিয়ে যেতে যেতে নজরে পড়ল সমস্ত জায়গাটি বেশ সুসংস্কৃত, অত যে জঙ্গল-ঝোপ ছিল—বলে বলেও কিছু করতে পারি নি এতদিন,—সব পরিষ্কার হয়ে গেছে; জল ছিটিয়ে ঝাঁট-পাট পর্যন্ত দেওয়া। আরও একটু এগুতে যখন দেখতে পেলাম ছোট বারন্দাটুকুতে সারি সারি পাম্ আর ফার্নের টব সাজানো হয়েছে—তার মধ্যে গোটা তিন যেন আমারই বারান্দা থেকে সংগ্রহ করা—তখন ক্রোধ আর কৌতূহলের দ্বিধার মধ্যে পড়ে যে একটু থমকে দাঁড়িয়েছি সেই সময় ঘরের ভেতর থেকে হঠাৎ এক ঝলক মুক্ত হাসির ঝটকা বেরিয়ে এল।...ব্যাপারখানা কি?...সান্ধ্যভ্রমণে ক্যাম্বিসের জুতো জোড়াটাই পরে নিই, তার ওপরও পা টিপে টিপে খোলা দরজাটা এড়িয়ে একটু পাশ দিয়ে বারান্দায় উঠে পড়লাম। গল্পটা কি ভাবে আরম্ভ হয়েছিল ভগবান জানেন, তার জের চলছে; রামকানাইয়ের গলা—

"তা হোকগা আইবুড়ো, আমার তাতে কি আসচে যাচ্ছে বল্। একটু দরদ থাকলেই হল। অবিশ্যি একটু মায়া-কান্না কাঁদতে হল, তবে মনে করেছিলুম আরও বেগ দেবে।...একটু তুলে ধর্ আরও।"

—একটা টানা শব্দ, যেন ন্যাতা দিয়ে লেপার মতো, তার সঙ্গে এবার মালীর আওয়াজ—

"আমি তোমায় বললুম নি? বলো গিয়ে, শুনবে। আইবুড়োদের দোষ থাকে, এই ধরো মাগ নেই, ছেলেপুলে নেই—স্রেফ বাগান আর বাগান—এখেনটা ছাঁটিস নি কেন এখনও, ওখেনটা ঘাস কেন অত বড়?—আরে মোলো, তোর মতন চাঁচা-ছোলা নয় তো রে বাপু! পাঁচটাকে নিয়ে ঘর করতে হয়, পাঁচরকম বখেরা, পেটের দায়ে মালীগিরি করচি বলে বাগান নিয়ে পড়ে থাকলেই চলবে?—বলো কানাইদা?..."

"চলে কখনও?...এবার একটু নাব্যে নে।"

"তাই বলচিমু, দোষ আছে, আইবুড়ো হলেই ওটুকু থাকতে হবে।...তেমনি আবার ফিচলেমির দিকটা মোটেই নেই।"

"নেই বলছিস ?"

—সঙ্গে সঙ্গে সেই ছপছপ আর টানা শব্দটা।

"থাকবে না কি না। বাবুদের য্যাতো ফিচলেমি সব মা-ঠাকরোনদের তরফ থেকে এসে ; দেখলুম তো এই বাড়িতেই কটা ম্যানেজার। ব্যাটাছেলে, সে তো একটু মোটাবুদ্ধিই হবে গো, হবে নি ? শিবঠাকুরকে দেখো না, আর পাশেই ঐ রণচণ্ডীকে দেখো না মৈসাসুরের বুকে পা দিয়ে। কিনে আনলে তো ছবিদুটো টাঙাবার জন্যে···"

ধ্যানমগ্ন নির্বিকার শিবের পাশে তাঁর রণরঙ্গিণী ঘরণীর মূর্তিতে কৌতুকাবহ নিশ্চয় কিছু আছেই, রামকানাই যাই করুক, একবার বোধহয় চোখ ফিরিয়ে দেখে নিলে, তারপর দুজনেই হেসে উঠল।

"তাই বলছিনু, ফিচলেমির দিকে যাবে না। এই তুমি ছুটি চাইতে গেছলে তো ?—বিয়ে-করা নোক হলে কি করত আমার কাছে শুনে থোও, অনেক ভুগিছি তো। এগুতে বলত—ঘুরে আয়, ভেবে দেখি। তারপর দেখতে কাজ করতে করতে কখন একবার সুরুত করে বাড়ির মধ্যে সেঁধে গেল।···ঐ, গিন্নির সঙ্গে সলা করতে চলল।···আমাদের মতন নয় তো—পুরুষের কথার মধ্যে দখল দিতে এলে এসা দাবড়ানি দোব যে বাপের নাম ভুলে যেতে হবে না ? তুই মেয়েমানুষ। হেঁসেল আর কচিকাচা নিয়ে থাক ! বড়লোকের তো উলটো রীত গো, চাবিকাটির মতন মেগের আঁচলে বাঁধা একেবারে···"

"তা মিছে বলিস নি। তবে একজন থাকলে তোর বৌদির খোরাকটা উঠে আসত বাড়ি থেকে। মাঝ-মদ্দিখান থেকে এক-একটা গিন্নি বেশ উতরেও যায় তো।"

"তাও দেখেছি। দেবতুল্যি একেবারে। তবে সে সব কি এরকম আইবুড়োর কপালে জোটে ? তা, তুমি ভেবো নি, বামুনঠাকুরের হাত বেশ দরাজ। আইবুড়োদের গিন্নি আবার ওরাই কিনা ··"

খুব মিষ্টি লাগছিল না নিশ্চয়, তবে টীকা মন্তব্য যেমন ঘন ঘন চলছে তাতে একটা ভদ্ররকম ফাঁক পাচ্ছি না যে ভেতরে গিয়ে দেখি ব্যাপারটা কি হচ্ছে। হার মেনে পা টিপেটিপে ফিরেই যাব মনে করছি, ঘুরে দেখি খানিকটা দূরে

পাচক ব্রাহ্মণটা টিফিন কেরিয়ারের একটা বাটি যেন একটু প্রচ্ছন্ন ভাবেই বুকের কাছে ধরে মাথা গুঁজে হনহনিয়ে চলে আসছে। আর উপায় রইল না। একটু পেছিয়ে এসে, যেন এইমাত্র বারান্দায় উঠলাম এইভাবে বারহিনেক জুতাজোড়া ঠুকে সোজা ঘরের মধ্যে গিয়ে উঠলাম।

কোথা থেকে একটা কুঁচি যোগাড় করে, চেয়ারের ওপর দাঁড়িয়ে রামকানাই ঘরে চুনকাম করছে; মালী জটাধর চুনের গোলার পাত্রটা দু হাতে তুলে ধরে দাঁড়িয়ে আছে। শুধু শিব আর দুর্গা নয়, দুজন সিনেমা-তারকার ছবিও রয়েছে জানলার পাশে রাখা, আর একটা ছবিওলা দেয়াল-পঞ্জী। সব টাঙানো হবে বুঝলাম।

বললাম—"তোমরা? আমি বলি ঘরে আলো জলে কেন! তা তুমি গেলে না যে?"

ও-ও চেয়ার ছাড়তে পারছে না, এ-ও হাত নামাতে পারছে না। উত্তর দিতেও দেরি হল রামকানাইয়ের। "আজ্ঞে···এই যে···মনে করলুম···"

এরপর জানাল অত ছুটোছুটি করেও বিকেলের গাড়িটা কোন-মতেই ধরতে পারল না। নটার গাড়িটায় যাবে।

চুন-ফেরানো, বা আগাছা পরিষ্কার, বা বারান্দার টব, এসবের কথা আর তুললাম না, আইবুড়ো মানুষ, বুঝবেও না তো।

দরাজ-হাত বামনঠাকুর আর এসে পৌছল না, কি উদ্দেশ্য কি নিয়ে আসছিল ভগবানই জানেন।

দুই

চারদিন পরের কথা। রবিবার; প্রায় বিকেল পর্যন্ত নিদ্রা দিয়ে অফিস ঘরে এসে বসেছি। টেবিলে এক গাদা ফাইল, কিন্তু চাইতে ইচ্ছে করছে না। কেমন একটা আলস্য জড়িয়ে রয়েছে দেহে মনে। গড়গড়ায় দুটো টান দিলে এ অবসাদটা কাটে, কিন্তু উপায় দেখছি না তার। রামকানাই নেই, মালী নেই, ঠাকুরটাকেও দেখছি না কোথাও। ঠাকুর অবশ্য তামাক ছোঁয় না, নাকি ওর

গুরুর মানা, আমিও ধর্মে হস্তক্ষেপ করতে চাই না; তবে থাকলে মালীটাকে খুঁজে-পেতে নিয়ে আসত পারত; সেজে দিত।

নিজেই উঠে একটু এগিয়ে দেখলে হয়তো দেখব দুজনেই বসে কোথাও গাঁজা টানছে; রবিবারের বাজার তো; কিন্তু দিবানিদ্রার অবসাদে চেয়ার ছেড়ে একেবারেই উঠতে ইচ্ছা করছে না।

আলস্য-অবসাদের মধ্যে রাগ বা বিরক্তিও আসতে পায় না মানুষের মনে; রামকানাইয়ের কথাটা একটা দুশ্চিন্তার আকারে ঘনিয়ে উঠছে। এবার যেন বড় বেশি দেরি করছে, ভাগল না তো? তা যদি হয় তো অগাধ জলে ফেলে দিয়ে গেল আমায়। লোকটা একটু বোধ হয় স্ত্রৈণ, কিন্তু ভৃত্য হিসাবে সত্যিই দুর্লভ। বেশি দিন নেই আমার কাছে, তবু এর মধ্যেই যেন একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। ও চলে গেলেই সেটা মর্মে মর্মে বুঝতে হয়, এবার যেন আরও বেশি করে দিচ্ছে বুঝিয়ে।

তারপর এই স্ত্রৈণ হওয়াটা। আমার কাছে এটা যত বড় অপরাধ বলে মনে হয়, আসলে কি সত্যই তত বড়? একটা মানুষের সঙ্গে সুখে দুঃখে নাগাড়ে একসঙ্গে থাকতে হলে মায়াতেই হোক কিংবা প্রয়োজনেই হোক, তার প্রতি একটা টান না হয়ে পারে? রামকানাইয়ের পরিবারটা আবার রোগেরোগেই কাটায়।

রামকানাই থেকে মনটা জমিদার-কন্যায় গিয়ে পড়েছে। দাসীর নামে ঐরকম একটা চিঠি—ঐ কাগজ, ঐ লেফাফা,—তাও একটা মাঝবয়সী দাসী,—মেয়েটা নকুলে, না, সত্যই এটা ব্যথার-ব্যথীর সমবেদনা?...তাই হয়তো। আর সেটা নিশ্চয় এতই খাঁটি যে আতিশয্যটা কোথায় হয়ে যাচ্ছে, ছেলেমানুষ তার আন্দাজই করতে পারে নি।

রামকানাইয়ের কাছে পাঠাতে হবে মালীটাকে। দরকার বলেই নয়; ওকে যে রূঢ় কথাগুলো বলেছি তার জন্য নিজেকে কেমন যেন অপরাধী বলে মনে হচ্ছে।···সুখ দুঃখ—বিশেষ করে এই দুঃখ জিনিসটা সমবেদনায় পৃথিবীতে ছোট বড়কে এক করে আনছে কেমন, তার মধ্যে আমরা কেমন যেন আলাদাই জীব এক···

'খুস' করে একটা শব্দ হল। যতক্ষণে ফিরে চাইব ততক্ষণে রামকানাই গড়গড়াটা মেঝেয় রেখে একটু ঠেলে দিয়ে পেছন থেকে নলচেটা বাড়িয়ে ধরেছে ; হাতে নিয়ে প্রশ্ন করলাম—"কখন এলে ?"

ভূমিষ্ট হয়ে খুব শ্রদ্ধাভরে প্রণামটুকু সেরে নিয়ে বলল—"এই খানিক আগে, আপনি তখন নিদ্রা দিচ্ছেন।"

"তারপর ?·· দেরি করলে এবারে বড্ড।"

"আজ্ঞে, তা···হয়ে গেল একটু দেরি·· একটা সংসার উঠিয়ে নিয়ে আসা···"

"তা বটে ; তাড়াহুড়ো না করে ভালোই করেছ ; রোগা মানুষ।···পথে অসুবিধে হয় নি তো ?"

আমারও দুটো দরদের কথা বলতে ইচ্ছে করছে। আগে ওর পরিবারের কথা মানেই ছিল আমার কাজের ক্ষতি, এখন তো আর সে ভাবটা নেই।

রামকানাই বলল—"আজ্ঞে না, ক্লেশ বলুন, অসুবিধে বলুন—সে সব কিছু হয় নি।· হত, দিদিমনিদের মটোরগাড়ির ড্রাইভার শ্যামসুন্দর হতে দিলে না কিনা···"

আমি মুখের দিকে চাইলাম।

"হত, এইজন্যে বলছি যে উদিকে গাঁ থেকে ইস্টিশেন অনেকখানি পথ তো, আপনার গিয়ে কোশ চেরেক হবে বৈকি ; তা শ্যামসুন্দর তো জানতেই দিলে না চার কোশ কি চার পো—"

"সত্যি নাকি ? বাবুর মোটর নিয়ে এল ?"

"গোটা চারেক গাঁট-গাঁটরি রয়েছে, এচরাক মেঞ্চার গোরুর গাড়িটা ঠিক করেছিলাম। শ্যামসুন্দর বললে—'রামকানাইদা, বুড়ো মানুষ, গোরুর গাড়িতে এই এতটা পথ ঘটোর-ঘটোর করে গেলে কি আর দেহের কিছু থাকবে ?—সেখানে গিয়েই মুনিবের কাজ নিয়ে পড়তে হবে আবার—তার চেয়ে দুটো দিন সবুর করো না। কলকাতা থেকে জামাইবাবু আসছে, সেই মোটর নিয়েই যেতে হবে তো, রাত থাকতেই বেরুব, চেপে বসবে'খন দুজনায়।···' মন তো আমার এখানেই পড়ে রয়েছে, বাবুর কষ্ট হচ্ছে ইদিকে, বললুম—"তা বেশ তাই হবে।"

বললাম—"ভালোই করেছ, সঙ্গে আবার একটা—রুগীই তো···কিছু বোধহয় লাগল বেশি গোরুর গাড়ির চেয়ে, তা সেটা না হয় আমিই দিয়ে দোব'খন।"

অস্বীকার করব না, মনটা একটু উদার হয়ে উঠেছে, ঠিক নিরাশ হওয়ার মুখেই তো ফিরে পাওয়া রামকানাইকে। রামকানাই কিন্তু যেন একটু শিউরে উঠল, বলল—"অধম্মের কথা বলতে পারব না বাবু। নিচ্ছে তো কে, উলটে ট্যাকের পয়সা খরচ করে দুখানা টিকিস কেটে নিয়ে এসে হাতে গুঁজে দিলে।··· 'রামকানাইদা, শহরে গিয়ে নতুন করে সংসার পাততে হবে, এখন যে-কটা পয়সা বাঁচল, তাই বাঁচল; বরং কিছু দিতে পারলে হত হাতে, খব নয়তো···' সে অনেক কথা···"

প্রশ্ন করলাম—"কেউ হয় তা হলে তোমার দেখছি···"

রামকানাই কুণ্ঠিত ভাবে একটু হাসল, বলল—"আজ্ঞে, শ্যামসুন্দর হল কায়েতের ছেলে, আর আমরা···"

রামকানাই মাহিষ্য। কিন্তু এদিকে কিছু ভেবে দেখবার আগেই জানলার দিকে নজর পড়তে দেখি ঠাকুর আর মালী, বোধহয় বাইরে থেকে এসেই একটু ঘাড় হেঁট করে হনহনিয়ে আউট্-হাউসের দিকে চলেছে। জানলার ফাঁকে যতটুকু দেখা গেল তাতে মনে হল ঠাকুরের হাতে একটা নূতন হাঁড়ি, এক হাতে একটা মালসা; মালীর হাতে একটা গামছার পুঁটুলি ঝুলছে, বোধহয় কাঁচাবাজার। কেননা পুঁটুলির মধ্যে থেকে রাঙা-মতো একটা যে কি বেরিয়ে রয়েছে সেটা কুমড়ার ফালি হওয়া সম্ভব।

এ দৃশ্যটুকু সম্বন্ধেও কিছু ভেবেচিন্তে ঠিক করবার আগে আর-একটা একেবারে অভিনব ব্যাপারে মনটা গুটিয়ে এল; ঠুং ঠুং করে একটু যেন চুড়ির শব্দ।··· ভ্রূ দুটো কুঁচকে উঠেছে, রামকানাই বাইরের দিকে মুখটা একটু ঘুরিয়ে একটু ধমকের সুরেই বলল—"র'; দুটো কথা হচ্ছে, হয়ে যাক, তারপর আসবি। না ত্বর সয়, এলিই চলে, মুনিবই তো।"

আমার দিকে চেয়ে টীকা করল—"এয়েছে পেন্নাম করতে।"

বললাম—"তা এতক্ষণ দাঁড় করিয়ে রেখেছ কেন? তোমার সঙ্গেই এসেছে তো?···কাহিল শরীর···"

"ঘরে কি পা দিয়েছে? রিকশা থেকে নেমেই বলে—চলো, আগে দেবতাকে গড় করে আসি, তারপর তোমার গেরস্থালি ভালোমন্দ দেখা। ···আয়; আর দাঁড়িয়ে কেন? ঐ তো শুনলি আদেশ।"

বেশ একটু হতচকিত হয়ে যেতে হল। রামকানাইয়ের বয়স পঞ্চাশ থেকে পঞ্চান্নর মধ্যে; কারুর কথা উঠলে বয়সের যে একটা আন্দাজ করে নেয় লোকে তাতে ওর পরিবারের বয়স আমি ধরে নিয়েছিলাম গোটা দশ বছর কম, চৌত্রিশ পঁয়ত্রিশের কোটায় হলেও বরদাস্ত করা যেত, তার জায়গায় ভেতরে এসে গলবস্ত্র হয়ে আমায় ভক্তিভরে যে প্রণাম করলে তার বয়স খুব বেশি করে ধরলেও পঁচিশের ওপরে যেতে পারেই না, ঐটুকুর মধ্যে যা নজরে পড়ল তাতে মনে হল কোন রোগ বছর দশেকের মধ্যে ওর ত্রি-সীমানায় ঘেঁসে নি।

একটু দেরি হল বৈকি আত্মস্থ হতে; যখন হলাম, দেখি আমি হতভম্ব হয়ে বসে আছি, কদম একই ভাবে ভুঁয়ে মাথা ঠেকিয়ে পড়ে আছে, রামকানাই মুখে একটা ছোট্ট হাসি নিয়ে আছে দাঁড়িয়ে—সেটাকে কুণ্ঠার হাসি বলব কি আত্মপ্রসাদের, বুঝে ওঠা দায়।

হুঁশ হতেই বললাম—"বাঃ, বেশ, ভালো।···তা হয়েছে, ওঠো।···কল্যাণ হোক।"

কদম যে ঘোমটাটা প্রায় নাকের মাঝামাঝি পর্যন্ত টেনে প্রণাম করতে ঝুঁকেছিল, উঠে কপালের ওপর পর্যন্ত তুলে দিয়ে জানলায় ঠেস দিয়ে দাঁড়াল। কয়েকটা মুহূর্ত এমন এক আড়ষ্টতার মধ্যে কাটল যে মুখ দিয়ে একটা কথাও বেরুল না। মেয়েটার তো চলে যাওয়া উচিত ছিল প্রণাম সেরে, তা তো গেলই না, অধিকন্তু যেন আলাপের প্রত্যাশায় এমন একটা সহজ ভঙ্গি নিয়ে দাঁড়াল, মনে হল আনত হয়ে ঐ প্রণামটুকুর মধ্যে দিয়ে সমস্ত কুণ্ঠা-সংকোচকে দেহমন থেকে নামিয়ে দিয়ে উঠেছে। একটা মেয়ের মধ্যে এত দ্রুত পরিবর্তন, আর এমন বিপুল, প্রথম দেখলাম এই। আমি ওকে বুঝব কি। ও যেন এক নজরে একটা খোলা-বইয়ের মতোই আমায় পড়ে নিল।

জড়তাটুকু কাটাবার জন্যই, যা মাথায় এল, জিজ্ঞাসা করলাম—"এই দুপুরের গাড়িতেই এলে ?"

"হ্যা !···ছটফট করছিলুম তো, বাবাঠাকুরকে একটু দেখে আসি, পায়ের ধুলো নে আসি। · বললে—ঘুমুচ্ছেন, বললুম—তা হলে থাক্।"

ভাবছি, এরপর কি জিজ্ঞাসা করা যায়।

"তুমি ভুগছিলে বড্ড। ভালো করেছ এসে।"

এসে কী সমস্যাতেই যে ফেলেছে সেটা অবশ্য মনে মনেই বুঝছি, এদিকে ঘরে চুনকাম থেকে নিয়ে সেখানে গাঁটের পয়সা দিয়ে টিকিট কিনে দেওয়া পর্যন্ত সমস্তরই স্পষ্ট টীকা তো চাক্ষুস।

কদম একটু হেসে রামকানাইয়ের দিকে ঘাড়টা ফিরিয়ে চাইল, আমায়ই প্রশ্ন করল—"তাই বুঝিয়েছে বুঝি আপনাকে ?"

তারপর মুখটা একেবারে অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিয়ে একটু হাসি টিপে বলল—"যে বুঝিয়েছে অমন করে সে নিজেই ভুগুক পড়ে পড়ে সারা জন্মটা।"

কি জিজ্ঞাসা করব, কি বলব তার পথ যেন আরও বেশি করে রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে ক্রমে। চিঠির কথাটা তুললে প্রগলভার মুখটা হয়তো বন্ধ হতে পারে; কিন্তু তা-তো আর পারা যায় না। যে নীরবতাটুকু কাটল তাতে রামকানাই একটু গরগর করলে অস্পষ্টভাবে, তারপর স্পষ্টকণ্ঠে বলল—"তুই বলতিস নে? ···একটা নোক বলছে তার দেহগতি ভালো নয়, আমি কি করে বুঝব কন? ডাগদারও নয়, কোবরেজও নয়···"

কদম ওকে উত্তর দেওয়ার দিক দিয়েও গেল না, একটু বিজ্ঞের হাসি হেসে আমায়ই বলল—"তখন আমি ভাবলুম—বারে, বাবাঠাকুরকে ভালোমানুষ পেয়ে এ তো দিব্যি যখন খুশি আসছে, যখন খুশি যাচ্ছে! রোস! এই তখন ভেবেচিন্তে এই বুদ্ধি বের করলুম—"

রামকানাই—"হুঃ!" করে একটু শব্দ করল; তাই দিয়েই যতটুকু আপত্তি ফুটে বেরোয়।

কদম নিজের কথা নিয়েই আছে, ওটুকু কানেও তুলল না, বলে চলল—"বললুম—তাহলে আমিও গিয়ে না হয় সেখানেই উঠি। এমনি নিত্যি কামাই,

নিত্যি কামাই হলে মুনিবের কাজ চলবে কেমন করে? তিনি ভালোমানুষ, তা বলে···"

"এই যে ঠাকুর! একবার এদিক হয়ে যেও।···জটাও আসবি।"

জানলার ফাঁকে নজর পড়ল ওরা দুজনে হাত আক্ষাড় করে ফিরছে। একটু চনমনে ভাব, গিয়ে ঘরটা তো খালিই দেখল।··· যা নিয়ে পড়েছি তার ওপর আর ওদের ডেকে ভেজাল বাড়াবার ইচ্ছা ছিল না, যা হচ্ছে হোক, খানিকটা চুপ করে দেখে যাই, কিন্তু বার দুই "ভালোমানুষ ভালোমানুষ" বলায়, মনে হল একটু না হয় বুঝিয়ে দিই। ঠিক অতটা ভালোমানুষ নয়।···গোড়াতেই একটু চোখ খুলে না দিলে, ব্যাপারটা দ্রুত জটিল হয়েই পড়বে তো।

ওরা দুজনে এসে দাঁড়ালে বললাম—"রামকানাইয়ের হাঁড়ি-কুঁড়ি সব কিনে দিয়ে এলে?··· জটে, তোর হাতে বুঝি কাঁচাবাজারটা ছিল?"

ধমকে নয়, কেননা তার তো প্রয়োজন নেই, চারজনকে শুধু জানিয়ে দেওয়া বসে বসে সব দেখছি; বিশেষ করে এই দুর্বিনীতাকে। ঠাকুর আর মালী মাথা তুলতে পারছে না। রামকানাই চেয়ারের পেছনে, অনুভব করলাম আরও একটু যেন পিছিয়ে গেল, কিন্তু মুখের পানে সোজাসুজি না চেয়েও যতটা স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায় তাতে বুঝলাম কদমের মুখের একটি রেখাও পরিবর্তন হয় নি। শুধু তাই নয়, আমাকেই সমর্থন করল, ওদের ঠেস দিয়ে একটু হেসেই বলল—"এযে উলটো ফল হল! চাকর তার সংসার তুলে নে এল, কোথায় নিশ্চিন্দি হব, না, ঠাকুর-মালীর পত্তন্ত দেখা নেই! এ রোগের কি ওষুধ রে বাবা!"

আমি একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। দুটো হাত পেছনে নিয়ে গিয়ে জানালায় ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েছে; ওদের দিকে চোখের কোণেও চাওয়া নয়; সোজা আমার দিকে দৃষ্টি, মুখে একটু সেই ব্যঙ্গের হাসি, এতবড় অঘটন ঘটবে যেন প্রত্যাশাই করতে পারে নি ···খানিকক্ষণ মুখে কথাই যোগাল না, তারপর ঢোঁক গিলে বললাম—"না, ইয়ে—এসেই আত্মাস্তর তো, তাই বলছিলাম—দিলে সামলে গোড়াটায় একটু?··· উচিত তো দেওয়া, একসঙ্গে কাজ করছ সবাই।··· যাও, ঐ কথা বলবার জন্যে ডেকেছিলাম···"

—আর কথা যোগাচ্ছে না বলেই চুপ করে যেতে হল। ওরা দুজনে দুদিকে চলে গেল—ঘাড় হেঁট করেই ; এটা বেশ বোঝা গেল, আমার কথায় সঙ্কোচটা একটু কেটে গিয়ে থাকলেও কদমের অভিমতে বেশ একটু চিন্তান্বিত হয়ে উঠেছে দুজনে। একটু নড়েচড়ে বসে গড়গড়ার নলটা বাগিয়ে নিয়ে রামকানাইকে বললাম—"নাও, এবার টেবিলটা আমার একটু গুছিয়ে ফেল দিকিন, কদিনের কাজ জমা হয়ে রয়েছে সেরে নিই।"

ইঙ্গিতটায় না বোঝবার মতো কোন অস্পষ্টতাই নেই, কিন্তু ফল বুঝি এ-ক্ষেত্রেও উলটো হয়। কদমও যেন নড়েচড়ে দাঁড়াল, একটু মুখ টিপে বলল—"পারে ?···এই তো ঘরদোরের ছিরি করে রেখেছে দেখছি···"

নিজেই এগিয়ে আসবে না তো !···তাড়াতাড়ি বললাম—"না, তা এসব বোঝে একরকম···বেশ ভালোই বোঝে।"

কদম আবার নড়েচড়ে যেন আরও গুছিয়ে দাঁড়াল, একটু বিদ্রূপের হাসি হেসে বলল—"বেশ দেখি, কতদূর দৌড়।"

ও নিজে যে ভালো পারবে তাতে আমার সন্দেহ নেই। মেয়েটা বাড়ি থেকে এসেছে যে খুব সেজেগুজে তা নয়, বরং ঠিক সাজা বলতে যা বোঝায় তার দিকে নিয়েও যায় নি, সেদিক দিয়ে এ বাড়িতে ও যে কী সে-জ্ঞানটা বেশ ভালোরকমই রয়েছে বলে মনে হয় ; কিন্তু সেই সঙ্গে বেশ একটা শহরঘেঁষা রুচিজ্ঞান আছে, যার জন্যে ওর-শ্রেণীর মেয়েদের মধ্যে দাঁড় করিয়ে দেখলে ওকে যেন একটু আলাদা বলে মনে হবেই।

যেমন গেলও না তেমনি এগিয়েও এল না। রামকানাই গোছাতে লাগল, ও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মন্তব্য করতে লাগল। গোড়া থেকেই—

"আগে বইখাতাগুলো নামিয়ে রেখে টেবিলটা ঝেড়ে নিতে হবে না ?"

রামকানাই নামাতে যাচ্ছিল—

"তা বলে ভুঁয়ে, ধুলোর ওপর ?···পাশে র‍্যাকটা তো রয়েছে, উরই ওপর রেখে দেওয়া যায় না ?···টেবিল-চেয়ার ঝাড়বার জন্যে একটা ঝাড়ন রাখতে হয় —ঝাঁটা দিয়েও হবে না, তেমনি আবার তোয়ালে নোংরা করাও চলবে না, যে কাজে যা···"

আমার দিকে চেয়ে বলল—"পড়ত বাবার মুনিবের হাতে!…"

একটা কিছু বলতেই হয়, প্রশ্ন করলাম—"খুব কড়া লোক বুঝি?"

"একদিন টেঁকতে পারত না। বাবা যে বাবা, অমন বিচক্ষণ চাকর, তাকেই অষ্টপ্রহর কাঁটা হয়ে থাকতে হত, ইনি তো কোন ছার। তাই শেষ কালে আস্তে আস্তে এগিয়ে দিলে কিনা আমাকে…"

খানিকটা ধোঁয়া গলায় হঠাৎ আটকে গিয়ে এমন কাশিয়ে ছাড়লে যে এটুকুর মধ্যেই কপালে ঘাম জমে উঠল আমার। সামলে উঠলে কদম আবার আরম্ভ করল—"তামাকটাও একটু নরম দেখে আনে লোকে।…বাবা আস্তে আস্তে আমায় ঠেলে দিলে।…একরকম ওদের বাড়িতেই মানুষ তো, আমায় ভালোও বাসতেন খুব—ছোট ছেলেমেয়ে নেই বাড়িতে—সব ছোট রতনদা—তাঁর বয়েসও তের চোদ্দ—স্কুলে যাচ্ছেন, কাজেই অভাবটা আমি মিটুচ্ছি কিনা, খুব ভালোবাসতেন—সব্বাই-ই; চাকরের মেয়ে বলে যে ঘেন্না কি তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য, সে-সব ছিল না—দাদুর তো নয়-ই—বড্ড ভালোবাসতেন তো… রেকাবি থেকে তুলে পঞ্চামৃত খেয়েছি—বাবা আচমকা দেখতে পেয়ে ছুটে গিয়ে চুলের মুঠি ধরেছে—কী তম্বি তার ওপর!—আট বছরের একটা শিশু—বলে শিশু দেবতা—ওর জ্ঞান আছে?…তোর মেয়ে, এত সম্পত্তি-জ্ঞান তো সরিয়ে নে!…না হয় তুই স্বত্ব…!"

হঠাৎ চুপ করে যেতে ফিরে দেখি মুখটা ঘুরিয়ে নিয়েছে। তারপর আর একবার গড়গড়া টানতে টানতেই চোখের কোণ তুলে দেখি আঁচলের খুঁট তুলে আস্তে আস্তে চোখ রগড়াচ্ছে।…ঘরের আবহাওয়াটা হঠাৎ বদলে গেল। রামকানাইয়ের দিকে ভালো করে মুখটা ঘুরিয়ে বললাম—"হল তোমার?"

অর্থাৎ কদম না বুঝতে পারে আমি দেখে ফেলেছি। তারপর আবার নলটা মুখে নিয়ে ওকেই প্রশ্ন করলাম—"হ্যাঁ…চুপ করলে যে?"

কদম সামলে নিয়েছে। মুখটাও নিয়েছে ঘুরিয়ে; একটু হেসে বলল—"মাথাটি ঐ করেই খেয়ে দিয়েছিলেন তো। ভুগছি।…পাকা চুল তোলা, ওটা এগিয়ে দেওয়া, এটা এনে দেওয়া, এই করতুন; বাবা আস্তে আস্তে আরও ঠেলে দিলে—লেখাপড়ার বাই ছিল তো—বইখাতা কেড়ে গুছিয়ে রাখা থেকে,

বিছানা করা, ঘর মোছা, ক্রেমে মায় তামাকটি সাজা পর্যন্ত—এমন অবস্থা দাঁড়াল, বাবা আমায় ঠেলে দেবে কি, কদম না হলে দাতুরই একদণ্ড চলে না···"

আবার গলাটা যেন ভারী হয়ে আসছে, বোধ হয় সে-ভাবটা সামলাবার জন্যেই একটু থেমে গিয়ে আবার রামকানাইকে নিয়ে পড়ল—"হয়ে গেল বুঝি ?"

রামকানাই চলে আসছিল, আবার ঘুরে চাইল টেবিলটার দিকে, তারপর আমার মুখের দিকে চাইল। একটা কিছু খুঁত ধরতে পারলেই ভালো হয়, কিন্তু কিছু খুঁতো তেমন নজরে পড়ছে না। অথচ কদম যে একটা কিছু বের করেছে এটাও ঠিক। এখনই বলবে—"বাবাঠাকুরকে ভালোমানুষ পেয়ে···"

আমি মাঝামাঝি একটা পথ ধরলাম, যেন দেখেও দেখছি না এই ভাবে একটু হেসে বললাম—"থাক, ঐতেই চলে যাবে আপাতত তাড়াতাড়ি রয়েছে তো··"

কদম একটু সেই ব্যঙ্গের হাসি হেসে সমর্থন করল—

"উপায় কি ?···কবে চাকরে ঠিক করে টেবিলটুকু গোছাতে শিখবে সে ভরসায় বসে থাকলে তো কাজই বন্ধ হয়ে যায়···"

"এইবার তোর কাছে নতুন করে শিখব।"

নিশ্চয়। উত্তরটা আর না দিয়ে পারল না, রামকানাই আমার চেয়ারের পেছনে চলে গেছে, সুবিধাও হল, আর চক্ষুলজ্জার বালাই নেই তো।

চক্ষুলজ্জার বালাই অবশ্য কদমেরও নেই। বেশ সোজাসুজি আমার মুখের দিকে চেয়ে, সাক্ষী মেনে বলল—"শেখালে যদি শিখত তো মানুষ হয়ে যেত ; আজ বিশ বছরে হার মেনে গেলুম।"

বিশ বছরে-র টীকা করে ও বুঝিয়ে দিল আমায়—

"পাঁচ বছরেই বাপ-মায়ে গছিয়ে দিলে কি না—জানেন তো আমাদের জেতের কাণ্ড।"

আমি চেয়ারটা টেবিলের কাছে টেনে নিয়ে একটা ফাইল তুলে নিলাম হাতে, পাছে কথাটা আবার বেড়ে যায় ; একটু হেসে খুব সংক্ষিপ্ত করে মন্তব্য করলাম—"কারেই বা কি বলি ?"

"বললেই বা কে শুনছে বলুন ? দেখছি তো দুনিয়ার হালচাল···"

কিন্তু আমি সঙ্গে সঙ্গেই ফাইলের পাতা উলটেছি। "এখন তাহলে আসি বাবাঠাকুর"—বলে আবার ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল। যেতে যেতে না ঘুরেই বলল—"এবার থেকে আপনি নিশ্চিন্দি থাকুন, কিছু ভাবতে হবে না।"

তিন

ঘর খালি পেয়ে দুর্ভাবনা চারদিক থেকে যেন ঘিরে আসতে লাগল। যে রকম সপ্রতিভ আর যে রকম ওর আত্মবিশ্বাস দেখছি। রামকানাইকে ঠেলে-ঠুলে আমার গৃহস্থালির কাজে আস্তে আস্তে ঢুকে পড়তে ওর মোটেই আটকাবে না। সেটা যে অনুচিত হবে তা আমি মনে করলেই তো কাজ হচ্ছে না, ওর মনে হবার কোন লক্ষণই তো দেখতে পাচ্ছি না। মেয়েটা যে কি রকম তা এত অল্প পরিচয়ে বলা যায় না। তবে বেশ একটি ভদ্র পরিবারে স্নেহ-প্রীতির মধ্যেই যে ভদ্রভাবে মানুষ হয়ে উঠেছে তা শুধু যে কথাতেই জানালে এমন নয়, আচরণেও দিলে জানিয়ে। তাই যদি হয় তো স্বামীর পাশে দাঁড়িয়ে তার ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি সংশোধন করে ও যদি তার প্রভুর সেবায় আত্মনিয়োগ করেই তো অনুচিতটা হচ্ছে কোন দিক দিয়ে তাও তো বেশ ধরা যাচ্ছে না। তাহলে একটা রূঢ় কথা বলে—না হয় ধরা যাক, ইঙ্গিতেই তাকে যে বিরত করব, তার শ্রদ্ধাকেই যে করব অপমান, তাই বা করি কি করে?

আকাশ-পাতাল ভাবছি ইজি-চেয়ারটায় গা এলিয়ে দিয়ে। ফাইলটা যে কোলের ওপর খুলে রেখেছি সেটা নিশ্চয় একটা অস্ত্র হিসেবে। মেয়েটার কোন হদিস পাওয়া যাচ্ছে না, কে জানে হয়তো এখনি আবার কোন একটা ছুতো করে আলাপ জমাবার চেষ্টা করবে, তখন ফাইলের পাতা উলটে আত্মরক্ষা করা ভিন্ন উপায় থাকবে না।

চিন্তার মধ্যেই এক সময় নিজের দুর্বলতায় নিজের কাছে লজ্জিত হয়ে পড়লাম। চাকরের স্ত্রী—তার একটা গণ্ডি আছে, সে নিজে যদি সে-সম্বন্ধে সচেতন না হয় তো জানিয়ে দিতে হবে বৈকি। এর মধ্যে এত আড়ষ্টতার কি আছে?

সোজাসুজি যদি না বলা যায় পাকে-প্রকারেই বুঝিয়ে দিতে হবে; তাতে না বোঝে, সোজা পথই ধরতে হবে শেষ পর্যন্ত।

একটা ঠিক করে ফেলতে মনটা বেশ সহজ হয়ে এল, ফাইলটা তুলে নিয়ে মনোনিবেশ করলাম তাতে। কাজ জমেছে অনেক, মনটা একবার এদিকে টেনে নেওয়ার পর বেশ এক মনেই কতকগুলো ফাইল পরিষ্কারও করে ফেললাম। উঠতে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এল।

কাজের চিন্তা নিয়েই উঠেছি, কদমের কথাটা একেবারেই মন থেকে নেমে গেছে। একটা একটু জটিল ফাইলের কথা ভাবতে ভাবতে লাঠিটা নিয়ে বাইরে থেকে একটু বেড়িয়ে আসতে যাব, একটা দৃশ্যে তাড়াতাড়ি হটে এসে দরজার আড়াল হয়ে দাঁড়াতে হল। মালী জটাধারী বাগানের ওদিকে টগরফুলের ঝাড়টায় একটু আড়াল হয়ে একটা ফুলের তোড়া বাঁধছে।

অস্বীকার করব না, প্রথমটা মনে করেছিলাম আমার টেবিলের জন্যেই বাঁধছে। অবশ্য, দিয়ে যায় যে এমন নয়; দশদিন বললে একদিন হয়তো দিয়ে গেল, হার মেনে আমিও ছেড়ে দিয়েছি, ও-ও নিশ্চিন্ত হয়েছে, তবু আমি যে আশা করলাম তার কারণ কদমকে যতটা বুঝেছি, নতুন এলেও এদিকটা একটু তাগিদ করে দেওয়া আশ্চর্য নয়। তা ভিন্ন ভাবলাম ফুলের তোড়া জিনিসটাই বড় বেশিরকম রোম্যান্টিক, একদিনে কি অতটা এগিয়ে যাবে জটাধারী? তবুও আন্দাজই তো, একটু আড়াল হয়েই দাঁড়ালাম।

এখান থেকে দেখা যায় না। ও বেরুলে পরে টের পাব এদিকে আসে কি ওদিকে যায়, তারপর বিলম্ব হয়ে যাচ্ছে দেখে সন্তর্পণে ঘাড়টা একটু বাড়াতেই মনে হল মালী যেন কার সঙ্গে মুখ ফিরিয়ে ফিরিয়ে কথা কইছে।

তখনই কিন্তু বেরিয়েও এল, পাশে পাঠক ঠাকুর; একটু ভেতরের দিকে ছিল বলে দেখতে পাই নি। তোড়া যখন দুজনের পরামর্শমতো তখন কোন দিক যাবে সে-বিষয়ে আর সন্দেহের কিছু নেই; তবু, নিতান্ত বেরুবার উপায় নেই বলে আর একটু আড়াল হয়েই দাঁড়িয়ে থাকতে হল খানিকক্ষণ।

কি বলাবলি করতে করতে দুজনে এক সঙ্গেই এল খানিকটা, তারপর ঠাকুর এদিকে চলে এল, মালী ঐদিক দিয়েই সোজা আউট-হাউসটার দিকে চলে গেল।

ঠিক করে ফেললাম অত চুলচেরা বিচার না করে হাঙ্গামাটা সত্তসত্তই চুকিয়ে ফেলতে হবে। ডাক দিলাম—"রামকানাই!"

ঠাকুরই বেরিয়ে এল, বলল—"সে তার বাসায় গেল এই মাত্তোর, ডেকে আনি গিয়ে?"

বললাম—"গিয়ে ডেকে আনা চাই? নইলে আসবেন না তিনি?"

'গিয়ে' কথাটার ওপর একটু জোর দিয়েই বলেছি, ঠাকুর একটু থতমত খেয়ে গেল, তবে উপস্থিত-বুদ্ধি হারাল না, বলল—"আজকাল কানে একটু কম শুনছে যেন, তাই...."

বললাম—"কই, তার তো কিছু দেখছি না, বরং চোখে কম দেখছে বলতে পারি।" ওর মনে কোন দাগ পড়ল বলে বোধ হল না; এত সূক্ষ্ম, পরিমার্জিত সাহিত্যিক আঘাতে ওদের কিছু হয়ও না। তবু, কি চাই ঠিক করতে না পেরে একটু যে বিমূঢ় হয়ে গেছে তারই মধ্যে পা বাড়িয়ে দিয়ে বললাম—"থাক।... বাসায় থাকে না কেন?"

ফটকের দিকে খানিকটা এগিয়ে আবার ঘুরে প্রশ্ন করলাম,—"জটাধারী আছে, না, চলে গেছে।"

যেন বাঁচল প্রসঙ্গটা বদলে যাওয়ায়; কিছুমাত্র দ্বিধা না করে বলল—"আজ্ঞে অনেকক্ষণ চলে গেছে সে।"

"গিয়ে দেখবে না হয় ওদিকটায় আছে কিনা—আউট হাউসটার দিকে?"

বেশ ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেছে। "থাক।...এত তাড়াতাড়ি চলে যায় কেন?"—বলে ফটকটা খুলে বেরিয়ে গেলাম।

রাগটা বেড়েই যাচ্ছিল, দেখলাম সরে এসে ভালোই করেছি। চাকরই হাত-পা আমার, আর সব দিক দিয়ে একরকম ভালোই, সুতরাং সোজাসুজি একটা অপ্রিয় কাণ্ড করে তুলে গৃহস্থালিতে অশান্তি ডেকে আনার দরকার কি? বেড়াতে বেড়াতেই একটা ঠিক করেও ফেললাম।

বাসায় এসে জুতো-জামা ছেড়ে বাইরের বারান্দায় পাতা ইজিচেয়ারটাতে পা এলিয়ে দিলাম। বাঁধা কাজ, একটু পরেই রামকানাই কল্‌কে সেজে নিয়ে এসে গড়গড়ার মাথায় বসিয়ে দিয়ে নলটা হাতে তুলে দিল। চলে যাচ্ছিল, ডাকলাম।

ঠিক করেছি চাণক্য-নীতির আশ্রয় নিয়ে এই দিক দিয়েই ভাঙনটা ধরাব। গোটাকতক টান দিয়ে বললাম—"একটা কথা তোমায় বলব মনে করেছি রাম-কানাই···আমার কেমন যেন ভালো লাগছে না—"

রামকানাই সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল। পাশে একটু পেছন ঘেঁসেই দাঁড়ায়, ঘুরে চাইতে হাত দুটো কচলে বলল—"আজ্ঞে, কী অপরাধ হয়েছে ?"

গৌরচন্দ্রিকা আর একটু বাড়িয়ে দিলাম—"অবিশ্যি, একেবারে তোমার নিজের কথা—অপরের কি রকম লাগছে না-লাগছে তার চেয়ে তোমার নিজের কেমন লাগছে সেইটেই বড় কথা। তবুও এক একটা ব্যাপার—এমনি সামান্যই, তবু একটু কটু লাগে না ? তাই ভাবছিলাম, তোমায় না হয় একটু বলেই দেখি —"

অল্প একটু মাথাটা ঘুরিয়ে দেখলাম সেই রকম হাত দুটি একত্র করে মাথা নীচু করে অপেক্ষা করছে, আমি থেমে যেতে মুখ তুলল।

বললাম—"আর কিছু নয়—তোমার স্ত্রী—চিঠিতে সেদিন কদম দেখলাম না নামটা ?—তা মেয়ে বেশ—হাসিখুশী, যেমনটি ভালোবাসি—কিন্তু ও কি—একটা লোক কাজ করছে—আর ভালোই কাজ করে—এতদিন তুই আসিস নি, সেই তো চালিয়ে নিয়ে এল—ভালোভাবেই চালিয়ে নিলে—তা প্রতিটি কথায় পাশে দাঁড়িয়ে খিটখিট, এটা হচ্ছে না, ওটা এই রকম হবে—এতে কখনও কাজ ঠিক করে উঠতে পারে লোকে ?"

নলটা মুখে দিয়ে টানতে টানতে একটু আড়ে চেয়ে দেখি, রামকানাইয়ের ভঙ্গিটা পূর্ববৎই, তবে, বোধ হয় গুরুতর কিছু আশঙ্কা করেছিল, মুখে একটু হাসি ফুটেছে।

একটু রং চড়াতে হল। আরও কয়েকটা টান দিয়ে বললাম—"আরও খারাপ লাগছিল এই জন্যে—অবিশ্যি আমার চোখে যেমন ঠেকেছিল সেইটে ধরেই বলছি—তুমি হচ্ছ তার সোয়ামী,—সোয়ামী হল আবার দেবতা, শাস্ত্রেই বলে দিয়েছে—তা বামনদের সোয়ামী দেবতা হবে, অন্য জাতের হলে হবে না, তার কাজের খুঁত দেখিয়ে ক্রমাগত টিকটিক করতে হবে এমন কথা তো—"

সেইভাবে একটু ঘুরে দেখি একেবারে গদগদ হয়ে গেছে রামকানাই, থামতে

হাসিটা আর একটু বাড়িয়ে বলল—"তা মানে বাবু, আপনার গিয়ে দেবতা বলেই মানে আমায়, স্বীকার না করলে অধম্ম হবে যে। ঐ যে বললেন কিনা—মেয়ে ভালো, তা সেটুকু খাঁটি কথা, আপনার দৃষ্টি তো এড়াতে পারে না। আর ঐ মেয়ে ভালো বলেই কখন কাজে খুঁত বের করে একটু নাক সিঁটকুচ্ছে সেটুকু ধরিনে—মনকে বুঝুই, মেয়েটার ভেতরটা সাদা, না হয় করলেই একটু খিটিমিটি, বানালেই তাহা মিথ্যেবাদী—ত্যাখন দেখলেন তো, অসুখের কথাটা আপনার সামনেই কি রকম উলটে দিলে—তা আমি মনকে বুঝুই ওসব ধরতে নেই, ভেতরটা যখন দেখছি সাদা—নিম্মল একেবারে—যেন পদ্মপত্রে জলবিন্দুটি —"

—এ যে উল্টো উৎপত্তি হল, ভাঙন ধরাব কি, প্রশংসার স্রোত থামতে চায় না! শুনে যাচ্ছি, কানে মধু বর্ষাচ্ছে বলে নয়, ভাবছি এ ওষুধ তো খাটল না, ভদ্রভাবে আর কি করা যায় তা হলে? স্রোতটি ঠেকিয়ে রাখবার জন্তেই বললাম—"সে কি কথা! ভালো মেয়ে নয়? মেয়ে ভালো নয় একথা ওর শত্রুতেও বলতে পারবে না, আমি শুধু বলতে চাই—"

কি বলতে চাই ভেবে ঠিক করবার জন্মে আবার নলটা মুখে দিলাম। কয়েকটা টান দেওয়ার পর একটা কথা মনে পড়ে গেল, বললাম—"আমি শুধু ভাবছি সেই মেয়েটির কথা। তোমাদের জমিদারের মেয়েটি—আহা, বাপ অত দেখে-শুনে বিয়ে দিলে, তা তুমি যেমন বলছ, শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে সম্বন্ধই নেই এক রকম। কদম তবুও কাছে ছিল, হোক দাসী, সমবয়সীই তো, আর যেমন শুনছি, ভালোও বাসত খুব—"

"একরত্তিও বাড়িয়ে বলছিনে বাবু; ভালোবাসতেই হবে যে!"

"সে কথা একশবার; দেখছি-ই তো। তাই বলছিলাম—কদমের কোন অসুখ নেই দেখছি—তোমায় বরাবর মিথ্যেই বলে আসছে—তখন সেখানে থাকলেই ভালো হত না?"

"থাকতে পারে না বাবু—ইদিকে আবার বড্ড ইয়ে তো, না দেখলে হেদিয়ে পড়ে।"

গলার আওয়াজে টের পেলাম কথাটুকু বলবার জন্তে আর একটু পেছনে সরে

দাঁড়িয়েছে। দায়ে পড়ে খোলাখুলি বলতে হচ্ছে, তবু চক্ষুলজ্জা তো আছেই মানুষের একটা।

উত্তর ভেবে ঠিক করছি, ওই আবার বললে—"সেই জন্যেই দিদিমণি নিজে চিঠিটা লিকিয়ে ব্যবস্থাটুকু করে দিলে কিনা।"

বললাম, "তাইতেই তো আমাদের নিজের সুখ-সুবিধার কথা আরও ভাবা চলে না, ভেবে দেখো না রামকানাই। অমন যার মন—নিজের কথা একেবারে না ভেবে ব্যবস্থাটা করলে, তাকে ভুলে থাকা কি চলে? একটিমাত্র মানুষ—দাসী হলেও যাকে মনের কথা বলা যায়—উচিত কি তাকে এরকম করে কাছ থেকে সরিয়ে রাখা?"

"এর মধ্যে একটা তত্ত্বকথা আছে বাবু।"

টের পাচ্ছি একেবারেই পেছনে সরে গেছে, যাতে একেবারে উলটে না চাইলে দেখতে না পাই। প্রশ্ন করলাম—"তত্ত্বকথাটা কি?"

"তত্ত্বকথাটুকু হচ্ছে—নিজেও যে দুখে দুখিনী, যাকে ভালোবাসি, কাছে কাছে থাকে, সেও সেই দুখে দুখিনী, এতে কথাটা তো লাঘব হয় না, বেড়েই যায়।—তার কারণ হচ্ছে…"

আর ঢাকাঢাকি রইল না কিছু। এক হিসেবে বোধ হয় ভালোই হচ্ছে, কেন না যেমন দেখছি, শেষ পর্যন্ত স্পষ্ট কথাই ধরতে হবে। বললাম—"বলো কারণটা কি।"

"ইদিক থেকেও দীগ্‌ঘ নিশ্বেস, উদিক থেকেও দীগ্‌ঘ নিশ্বেস, তাতে হাওয়াটা আরও তপ্ত হয়ে ওঠে কি না।"

বললাম—"খুবই সম্ভব। তা এক কাজ কর না, তাতে দু-দিকই বজায় থাকে।"

"আজ্ঞে করুন।"

ভূত ঝেড়ে তো ফেলি গা থেকে, পরে তখন দেখা যাবে, বললাম—"রেখেই এস যেমন ছিল। তারপর তুমিও যেতে থাক যেমন যাচ্ছিলে, বরং এক কাজ কর—গিয়ে অত দিন বসে বসে না থেকে—বারে বরং বাড়িয়ে দাও। দীগ্‌ঘ নিশ্বাসটা জমতে পাবে না—শরীরে যে কোন রোগ নেই তা তো দেখলাম—এ বরং ভাবব একটা কাজ হচ্ছে। কষ্টেসৃষ্টে চালিয়ে নোব।"

চেষ্টা সত্ত্বেও একটু বোধ হয় ঝাল এসে গেল কথাগুলোতে।

রামকানাই একটু ভাবল—তারপর বলল—"কথাটা ভালো, অনেক ভেবেই বলেছেন তো আপনি। কিন্তু ইদিকে যে এক নতুন সমিস্যে হয়েছে… …"

"শুনি, সমিস্যেটা কি ?"

"কদম যে নড়তে চায় না এখান থেকে। বলছেল—তোমরা তিনজনে মিলে দেবতাকে নাজেহাল করছ—ভালোমানুষ, কিছু বলেন না, এবার কিন্তু আমি এলুম, সবাইকে সায়েস্তা করব, মনিবের সেবা কি করে করতে হয় শিখিয়ে দেব সবাইকে। এখেন থেকে আউট-হাউসে গিয়ে অবধি এই নিয়ে গরগর করছে তো। আপনার দয়া-মমতার শরীল, যা বলবেন তার ওপর কি কথা আছে ? কিন্তু নড়াবে কে ওকে এখান থেকে ?"

আর কত পারে লোকে ?—মানুষেরই শরীর তো ? এরপর একটি মাত্র উত্তর ছিল, "তবে তুমি সুদ্ধু পথ দেখ বাপু।" নলচেটা মুখ থেকে টেনে নিয়ে সেই কথাটা বলতে যাব, এমন সময় নজরে পড়ল কদম হনহন করে এই দিকেই চলে আসছে। হাতে গোলপানা একটা কি রয়েছে, কাছে এসে পড়তে টের পেলাম, ফুলের তোড়া একটা।

বারান্দার নীচেই দাঁড়িয়ে পড়ে বলল—"একি, ঘরে আলো জেলে দেয় নি এখনও ?"

তারপর রামকানাইয়ের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল—"অন্ধকারে ঘর ভরে গেছে এ কথাটাও লোকে এসে বলবে তবে হবে ?"

ব্যঙ্গ হোক, তিরস্কার হোক, এ জনের ওপরই খাটে ; কতকটা যেন জবাবদিহি দেওয়া হিসাবে আমি কিছু বলবার আগে রামকানাই একটু কাঁচুমাচু হয়ে বলল—"জ্বালব মনে করেই তো এসেছিলুম………"

সঙ্গে সঙ্গেই ভেতরের দিকে তাড়াতাড়ি পা বাড়িয়ে দিয়েছে কদম, বলল,—"সত্যই তো, মনের কথা বুঝে নিয়ে আলো সঙ্গে সঙ্গে না জ্বলে তো আমি কি করব ?"

উঠে এসেছে, তোড়াটা সামনে একটু বাড়িয়ে ধরে বলল—"আর, এই আর একজনের কাণ্ড দেখুন না !"

সব জেনেও জিজ্ঞাসা করলাম—"তোড়া কোথা থেকে এল? বাঃ, বেশ চমৎকার তো!"

"চমৎকার না হলে হয়? আপনার মালী নিয়ে গিয়ে হাজির, এই সন্ধ্যের একটু আগে। জিগ্যেস করলুম—"হঠাৎ তোড়া—এরকম ঘটা করে? বলল—রামুদার ঘরে থাকে একটা করে। ......'তাই নাকি? কই, রামুদার মনিবের ঘরে তো একটাও দেখলাম না।' না, 'তিনি পছন্দ করেন না, শখের দিকটা একেবারে বাদ পড়ে গেছে কিনা।'...উত্তরটা একটু ভালো করে শুনে রাখুন—কিনা শখের দিকটা যখন একেবারে বাদ পড়ে গেছে, তখন তাঁকে ফুলের তোড়া যুগিয়ে শুধু অপচয় তো, তার চেয়ে যার শখ আছে তাকে দিলে বরং কাজ হবে। ......ঐ তো শোকোর চূড়ামণি দাঁড়িয়ে আছেন পেছনে, জিগ্যেস করুন না।"

ভাগ্যিস হাতে গড়গড়ার নলটা ছিল, ঘন ঘন টানতে লাগলাম। অনুভব করছি রামকানাই পেছনে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তারই পাশ দিয়ে কদম গরগর করতে করতে ঘরের ভেতর চলে গেল।

করেই যাচ্ছে গর-গর—"এসব লোক দিয়ে আপনার চলে কি করে? মনে করলুম তখুনি বলি আপনার টেবিলে রেখে আসতে। তারপর ভাবলুম—না, তাহলে তো হবে না, আসুন বেড়িয়ে, তখন নিজে নিয়ে যেতে হবে আর জিগ্যেস করে উত্তরটা নিতে হবে—ফুলের তোড়া দেখলে সত্যই নাকি গা বমি-বমি করে?... আস্পর্দ্ধা!......মুনিবের ঘর শ্রীক্ষেত্তর, উদিকে চাকরের ঘরে ফুলের তোড়া পৌঁছুচ্ছে!......ফুলদানি আছে বাড়িতে?"

প্রশ্নটা রামকানাইকে। রামকানাই নিশ্চয় গোঁফ ফুলিয়েই বলল—"থাকবে না কেন?"

আমারও কিছু বলা দরকার, এই সুযোগেই একটু অনুযোগের স্বরে জুড়ে দিলাম—"একটা নয়, গোটা চারেক আছে।"

চাকরের পরিবার, কোন সম্বন্ধও নাই আমার গৃহস্থালির সঙ্গে, তবু কোথা দিয়ে কি করে এমন একটি জায়গা করে নিয়েছে এর মধ্যে যে আমার যেন কতকটা আত্মপক্ষসমর্থনেই বলতে হল কথাটা; আমি তো চাই ছিমছাম থাকুক

বাড়িটা, যোগাড়ও করে দিতে কৃপণতা করি নি, এরা এরকম করে রাখলে কি করি, কত দিকে নজর রাখি ?

অর্থাৎ মেয়েটার কাছে হার মানলাম, ওর সেবা-যত্ন আমায় স্বীকার করে নিতে হল, সেবাই বলি বা অভিভাবকত্বই বলি। কিন্তু চিন্তার বিষয়ই তো। কদম যে ঘরটা নিয়ে বেশ ভালোভাবেই পড়েছে, ওর গরগরানির মধ্যে দিয়ে, রামকানাইয়ের সঙ্গে মাঝে মাঝে ওর কথা কাটাকাটির মধ্যে দিয়ে টের পাচ্ছি। ঘরের দিকে পেছন করে, আরাম চেয়ারের উঁচু পিঠের আড়ালে গা এলিয়ে দিয়ে গড়গড়া টানছি আর ভাবছি। কিছু কূল-কিনারা পাচ্ছি না ভেবে।

খানিক পরে নেমে একটু ত্রস্তপদেই চলে গেল। বারান্দা দিয়ে যেতে যেতেই শুধু একবার মুখটা ঘুরিয়ে বলল—"ভেতরে গিয়ে বসুন এবার ; কার্ত্তিকের হিমটা ভালো নয় এ বয়সে।"

সঙ্গে সঙ্গেই অবশ্য উঠলাম না। কার্তিকের হিম তো বর্তমান সমস্যা নয় আমার। যখন এলাম ভেতরে যেন একটা নতুন ঘরে এসে ঢুকলাম। প্রত্যেকটি চেয়ারের যে নিজের একটা বিশেষ ঠাঁই আছে ঘরের মধ্যে, আগে তা জানতাম না, ঝাড়া-ঝোড়া তকতকে ঝকঝকে তো বটেই, তবে শুধু বিন্যাসের মধ্যে দিয়েই একটা যেন নতুন শ্রী ফুটেছে। টেবিলটাতেও বই-খাতা দোয়াত-কলম, ব্লটার প্যাড, পেপার-ওয়েট, পিনকুশন নিয়ে এমন কিছু হয়েছে যাতে মনে হয় ওগুলো শুধু শুষ্ক প্রয়োজনের জিনিসই নয়, ফাইলগুলোও পাশে পাশে সাজানো। ঘরের সৌন্দর্যেও ওদের দান যথেষ্ট। নিচেরটা টানতে গেলে আর ছত্রাকার হয়ে যাবার ভয় নেই। ফুলের তোড়াটা দ্বিখণ্ডিত হয়েছে, প্রতি খণ্ডই সম্পূর্ণ এবং আরও সু-রচিত ; একটা রয়েছে টেবিলে আর একটা তাকের উপর, টাইম-পীস ঘড়িটার পাশে।

টেবিলের আলোটাও কদমের হাতের স্পর্শ পেয়েছে ; বাল্ব, শেড, স্ট্যাণ্ড ঝকঝকে করে মোছা, আলো বিতরণ করছে সে যেন একটি স্নিগ্ধ প্রসন্নতার মধ্যে দিয়ে ;

রামকানাই ঘুরঘুর করছে আমার আশেপাশে থেকে। ধমক খেয়েছে কদমের কাছে, তবু আমার মুখে কি দেখেছে, কিছু যেন শুনতে চায়। তামাক

সেজে নিয়ে এল, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই, পেছনে দাঁড়িয়ে কলকেয় ফুঁ দিচ্ছে তো দিচ্ছেই। প্রশংসা ঠেলে আসছে বইকি মুখে, শুধু ভাবছি—প্রশ্রয় দেওয়াটা কি ঠিক হবে? সমস্যাটা তো এক দিনেই যথেষ্ট জটিল হয়ে দাঁড়িয়েছে।

শুধু বললাম—"ঠাকুরকে বলে দাও আজ একটু রাত হয়ে যাবে বোধহয় আমার, খাবার যেন ঠাণ্ডা হয়ে না যায়।······অনেক কাজ জমেছে।"

ঘরের শ্রীতে, টেবিলের শোভায়, কাজ আমায় টানছে।

চার

তার পরদিন সকাল থেকেই লক্ষ্য করছি কদম যেন সহজ অধিকারেই এ-ঘর ও-ঘর করে বেড়াচ্ছে। অবশ্য, কাজ, অর্থাৎ গোছগাছ করা নিয়েই। আরও দেখলাম, কাল প্রথম বারেই যেমন মনে হয়েছিল, গায়ে-পড়া, ঝেড়ে ফেলে দিতে চাইলেও ছাড়ে না, ঠিক সেরকম হয়তো নয়। কয়েকবারই চোখে পড়ল, কদমও দেখল, কিন্তু কিছু বলল না। অনধিকার-চর্চা মনে করছি কি না-করছি দৃষ্টিতে সে প্রশ্নও নেই; কাজ করে যাচ্ছে। রামকানাইয়ের ওপর সেই গরগরানিও নেই। যেন এ-মানুষকে কত আর বলবে?

মালী নিজের কাজে আছে। ঠাকুরও যথাস্থানে, বাড়তির মধ্যে শুধু একটা নূতন গেঞ্জি কিনে গায়ে দিয়েছে। তারও বাড়তির মধ্যে পুরোপুরি সাদা নয়, গলার চারিদিকে নীল বর্ডার। কাল হয়তো দেখব চুল ছাঁটিয়েছে, পরশু হয়তো দেখব মালীও ধরেছে এই পথ। উপায়ই বা কি এর? গায়ে যাই দিক তাতে আমার গায়ে ফোস্কা পড়লে চলবে কেন? চুল যে-ভাবেই ছাঁটাক, মাথাটা যদি ঠিক জায়গায় রাখতে পারে তাহলেই তো হল আমার।

সেটা ওরা না পারে, কদম আছে।······আজ মালী সকালেই চারটে ফুলদানির জন্য চারটে তোড়া বেঁধে দিয়ে গেছে। এরপর কালকের বাসী ফুটো যদি গিয়েই থাকে আউট-হাউসে তো আমার তাতে বলবার কি আছে?

যখন আহার করতে অফিস থেকে ভেতরে এলাম দেখি কদম ভাঁড়ারটা নিয়ে পড়েছে। ঝাড়ছে, গোছাচ্ছে; ঠাকুর চৌকাঠের বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছে,

ভাঁড়ার ঘর তো তারই এলাকায়, রামকানাইও সামনেই উবু হয়ে বসে আছে, কি সব গল্প হচ্ছে তিনজনে। আমি আসতে ঠাকুর ভাত বাড়তে চলে গেল, রামকানাই উঠে গেল জায়গা করতে ; কদম চুপ করে কাজ করে যেতে লাগল। খেতে বসলে রামকানাই পাখাটা নিয়ে এসে সামনে দাঁড়িয়ে হাওয়া করতে লাগল। এই সময়টা সংসারের খুটিনাটি নিয়ে কথাবার্তা হয় এদের সঙ্গে ; কি আনতে হবে না হবে, বাজারের কি দর যাচ্ছে, আরও অন্য কথা যদি কিছু থাকে।

জিজ্ঞাসা করলাম—"তুমি তাহলে এবার কি করছ রামকানাই? দেশ থেকে তো নিয়ে এলে সবাইকে।"

"আজ্ঞে?"—বলে রামকানাই পাখাটা থামাল। বুঝতে পারে নি উদ্দেশ্যটা। ভাঁড়ার-ঘরটা কাছেই, দেখলাম কদম চৌকাঠের পাশে একটু আড়াল হয়ে দাঁড়াল এসে। মনে হল ও যেন বুঝেছে এবং কথাটা কখন ওঠে তার জন্য যেন কান পেতেই ছিল।

রামকানাইয়ের প্রশ্নের উত্তরে বললাম—"বলছিলাম এতদিন তো খোরপোষ আর মাইনে ছিল, এবার হেঁসেল একটা তো তোমায় পাততেই হচ্ছে ওদিকে, তা তুমি যেমন এখানেই খাচ্ছিলে তাই খাবে, না, ঐ হেঁসেলেই ব্যবস্থা করবে? এইজন্যে বলছি যে এখন যদি খোরাকের বদলে শুকো মাইনেটা কিছু বাড়ে তো তাতে তোমার সুবিধে আছে বোধহয়।"

বারান্দায় বসে খাচ্ছিলাম, কদম বেরিয়ে এসে পাশের থামটায় ঠেস দিয়ে দাঁড়াল। বললাম—"এই তো কদমও রয়েছে, তোমাদের কি রকম সুবিধে হয় বল ; না হয় দুজনে পরামর্শ করে এর পরেই বোলো।"

কদমই উত্তর দিল—"কি এমন হাতি-ঘোড়া ব্যাপার যে পরামর্শ করে তবে উত্তর দিতে হবে বাবাঠাকুর? আর পরামর্শ করার ঐ তো মানুষ। মানুষ বললেও হয়, আর······সে দেখতেই তো পাচ্ছেন। আপনি যা বলছেন শুকো মাইনেটা বাড়িয়ে দেওয়া—তার ওপর আর কথা কি আছে? আমাদের মুখ চেয়েই বলছেন তো, গরিব মানুষ, শাক-ভাত খেয়ে যে-কটা টাকা বাঁচিয়ে রাখতে পারি ভাবব তাই বাঁচল। আমাদের মুখ চেয়েই বলছেন, কিন্তু আপনার

তাতে সুবিধে আছে কি?…… সে-কথা অবশ্যি ভাববেন না আপনি; কিন্তু আমাদেরও তো ভেবে দেখা উচিত, অনেক নুন পেটে গেছে তো।"

বললাম—"আমার তো সুবিধেই এক হিসেবে, ছিল তিনজনের সংসার এতদিন, এবার দুজনের হবে—আরও হালকা হবে।"

কদম হঠাৎ একটু বেশি করেই হেসে উঠল, বলল—"আপনার ঐ এক হিসেব, ঐ সুবিধে—তিনজনের জায়গায় দুজন, দুজনের জায়গায় এক……"

তেমনি হঠাৎ থেমে গম্ভীর হয়ে গেল। আমার একাকিত্ব নিয়েই তো কথাটা, নিশ্চয় হুঁশ হল বড় বেশি স্বাধীনতা নেওয়া হচ্ছে। আমি প্রশ্ন করলাম—"তা অসুবিধেটাই বা কোথায়?"

সত্যি কথা বলতে কি, কাল থেকে আজ মেয়েটাকে ভালো লাগছে। তার কারণ বোধহয় যতই কাছাকাছি আসছে ততই ওর সম্বন্ধে আতঙ্কটা যাচ্ছে কেটে। এখন কতকটা যেন এইরকম দাঁড়িয়েছে,—ওকে বাড়িয়ে রাখাটা নানা কারণে সমস্যাজনক হলেও, ও নিজে একটা সমস্যা নয়। এ ক্ষেত্রে যতক্ষণ পর্যন্ত ভদ্রভাবে ওকে সরানো না যাচ্ছে, ততক্ষণ বেচারা ওর প্রাপ্য স্নেহ থেকে বঞ্চিত হয় কেন?……কতকটা ওর সঙ্কোচটুকু কাটাবার জন্যই প্রশ্নটুকু করলাম আমি।

"বলছিলুম…"—কদম আরম্ভ করে আবার থেমে গেল।

বললাম—"বল না কি বলছিলি।"

"বলছিলুম—ওকেও বাড়িয়ে দেবেন আবার এদিকেও যেমন চলছিল চলবে তো? যেমন বলি কেন—এখন তো একটার জায়গায় দুটো পেট হল।"

ঠাকুর ডাল নিয়ে বেরিয়েছিল রান্নাঘর থেকে, আবার যেন ত্রস্ত হয়েই পেছন হেঁটে ঢুকে পড়ল। আন্দাজ একরকম করেছিই, বিশেষ-করে ঠাকুরের ওভাবে গা-ঢাকা দেওয়ায়; তবু, যেন কথাটা বোঝবার জন্য সময় নিচ্ছি এই ভাবে খেয়েই যেতে লাগলাম ঘাড় হেঁট করে। শেষে মৌনটা অস্বস্তিকর হয়ে পড়ায় কইতেই হল কথা; বললাম—"বুঝলাম না তো।"

"কাল রাত্তিরে রেঁধেছিলুম তো যেমন রাঁধবার, অবিশ্যি একজনের যুগ্যিই তো রান্না হয়ে গেছে এমন সময় সরকারী হেঁসেল থেকে সব এক প্রস্ত করে দিয়ে

হাজির, শুধু ভাতটা বাদে।···শুনলুম—আপনিই নাকি বলে দিয়েছেন। জিগ্যেস করলুম—"এসব আবার কেন?"

একটু নিস্তব্ধতা এসেই গেল, একটা কথা যোগানোও চাই তো। তারপর বলেছি কি না-বলেছি সে কথা না তুলে মন্তব্য করলাম—"তা প্রথম দিন, গেলি কেন রাঁধতে? ক্লান্ত হয়ে ছিলি তো?"

"আজ তো প্রথম দিন নয়।···মালী সকালেই গিয়ে বলে এল, আজ ভাত রাঁধবারও দরকার নেই।"

ঠাকুর বেরুতে পারছে না, অথচ ঘণ্ট, শুক্ত, ঝোল—এদিককার সব শেষ করেছি, ডালটা এবারে দরকার।

আবার একটু ভেবে বললাম—"তা একজন গেলে আমার ভাঁড়ার শুকিয়ে যাবে না।····আর, রাঁধবিই বা কখন? সমস্তদিন তো এখানেই খাটছিস।"

আবহাওয়াটা একটু অনুকূল দেখে ঠাকুর ডালের বাটিটা রেখে গেল।

কদম একটু হেসে বলল—"বাসায় কাজ কি? তার ওপর রান্নার পাটটুকুও না থাকলে করবই বা কি বসে বসে বলুন?"

একটু থেমে হেসেই বলল—"সে কথা নয়। আমার তো সুবিধেই। যেখানে ছিলুম রাজভোগ খেয়ে খেয়ে বদ-অভ্যেস হয়ে গেছে, ভগবান এখানেও যদি দেন জুটিয়ে 'না' বলতে যাব কেন? কিন্তু কথাটা হচ্ছে, আপনি এদিকে আপনার চাকরের শুকো মাইনেটা বাড়িয়েও দেবেন, ওদিকে খোরাকও যাবে পৌঁছে···"

ঠাকুর অম্বল আনতে পারছে না। বললাম—"বেশ, তাহলে না হয় যেমন ব্যবস্থা আছে তেমনি থাক, এখানেই খাক রামকানাই।"

"আর আমি?···সেই রান্নাও করব, তারপর—আপনার হুকুমে ···"

"না হয় তুইও খেলি দুবেলা দুমুঠো; মরে যাব তাতে?"

—কথাটা হালকা করে দেওয়ার জন্য একটু হেসেই বললাম—"বলছিলিই তো রাজভোগ খাওয়ার অভ্যেস···"

একটু শিউরে উঠল কদম, বলল—"রক্ষে করুন!···রাজভোগ বলছিলুম সে সরঞ্জামের দিকে থেকে, খরচটা তো কম হচ্ছে না, উপচারেরও অভাব নেই; কিন্তু

রান্না! সে কথা তুলে আর কাজ নেই।…আপনি দেবতা মানুষ, যা দিচ্ছে সামনে ধরে তাই ভালো আপনার কাছে…"

ঠাকুর অম্বল দিয়ে দুধের বাটিটা রেখে চলে গেল। খুব বেশি যে গরম, সে হুঁশটা ওর অবশ্য আজ থাকবার কথা নয়। রামকানাই পাখাটা বাটির কাছে নামিয়ে হাওয়া করতে শুরু করেছে, কদম তাড়াতাড়ি রান্নাঘরে গিয়ে একটা কাঁশি নিয়ে এল। দুধটা তাইতে ঢেলে পাখাটা রামকানাইয়ের হাত থেকে নিয়ে জুড়ুতে জুড়ুতে বলল—"ঠাকুর তো আগুন এনেই দিয়ে গেলেন, এই আর এক বুদ্ধির ঢেঁকি দেখ না। খুচখুচ করে হাওয়া করে দুধের বাটি জুড়ুচ্ছেন—বাবার ওদিকে অফিসের বেলা হয়ে যাচ্ছে!"

আঁচাতে আঁচাতে বললাম—"তাহলে ঠাকুর, ওরা দুজনেই এখানে খাবে, শুনলে তো।…তাহলে শুকো বলে সেটা বাড়াব বলেছিলাম সেটা আর হবে না রামকানাই, অনেক পড়ে যাবে আমার। আর ঠাকুর, রান্নার দিকটা একটু দেখো, বেটি অব্যেস খারাপ করে এসেছে।"

ব্যবস্থাটা এক হিসেবে ভালোই হল। কদম অবশ্য বাড়িতে আরও কায়েমী হয়ে বসল আপাতত; কিন্তু তার তো উপায় ছিল না। সুবিধাটা এই হল যে, যদিও আমার ভাঁড়ার যেটুকু খালি হবার তা হবেই, তবু জিনিসগুলো ঠাকুরের তরফ থেকে ভোগ-নৈবেদ্য হিসাবে দুবেলা আর আউট-হাউসে পৌছবে না। আরও একটা কথা, মেয়েটা যেমন লাগিয়েছে তাতে এদের সঙ্গে বেশি দিন আর বনিবনাও থাকবে না, ঠাকুর আর মালীর সঙ্গে তো নয়ই, রামকানাইয়ের সঙ্গেও মন-কষাকষি হবার চমৎকার একটি সম্ভাবনা রয়েছে। ভেবে দেখলাম এ-ক্ষেত্রে এদের যদি একত্র ধরে রাখা যায় তাতে খিটিমিটি বেড়ে গিয়ে অভীপ্সিত ফলটি অবিলম্বেই পাওয়া যেতে পারে। আমি তো পারলাম না সরাতে; এদের বিরূপতায় যদি কিছু কাজ হয়। আন্দাজটা যে ভুল হয় নি সেটা দুদিন পরেই টের পেলাম।

কার্তিক মাস, ঘোর-সার সময় কদিন থেকে শরীরটার তেমন জুত নেই। দুপুর বেলা, কপালটা টিপটিপ করছিল, দরকারী কাগজপত্রগুলোর ওপর অর্ডার দিয়ে বাসায় চলে এলাম। আমার শোবার ঘরটাও বাইরেই, অফিস ঘরের সংলগ্ন, জামা-জুতা ছাড়তে ছাড়তে রামকানাইকে হাঁক দিয়ে ডাকলাম।

উপস্থিত হল কদম। কি করছিল, হাতটা কাপড়ে মুছতে মুছতে এসে দাঁড়াল, প্রশ্ন করল—"ডাকছিলেন ?"

তারপর একটু উৎকণ্ঠিত-স্বরেই আবার প্রশ্ন করল—"আজ এখুনি চলে এলেন যে ? শরীর ভালো আছে তো ?"

লুকোলাম ; সেবা-তদারকের অত্যাচার এমনিই তো যথেষ্ট হচ্ছে। একটু তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললাম—"শরীরের কি হবে খামোকা ? কাজ ছিল না তেমন. চলে এলাম।···রামকানাই কোথায় ? একটু তামাক দিত।"

কথাটার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখবার জন্যে আর শুলামও না। ইজি-চেয়ারে গা এলিয়ে পড়ে রইলাম। একটু পরে কদমই কলকেতে ফুঁ দিতে দিতে গড়গড়াটা নিয়ে এল।

নলচেটা হাতে নিয়ে বললাম—"রামকানাই কোথায় ? তুই এখন করছিলি কি ?"

নিজের সম্বন্ধে প্রশ্নটায় একটু শুধু হাসল। ছোট্ট সংসার, তারই ভাঁড়ার, তৈজসপত্র, আসবাব নিয়ে থাকে সর্বদা, উলটে-পালটে ঝাড়ছে, গোছাচ্ছে, ফুরসত থাকে না, ভালোও বাসে না ফুরসত আবার। প্রশ্ন করলাম—"তা রামকানাই কোথায় ? তুই যে একলা রয়েছিস ?"

"বাড়িটা আগলাতে হবে তো। যার থাকবার কথা সে যদি না থাকে····"

"গেল কোথায় ?—সেই কথা জিগ্যেস করছি। এ-সময় তো বাসা ছেড়ে যাওয়ার কথা নয় তার।···ঠাকুরেরও।"

"মিটিন্ হচ্ছে···তিনজনের।"

চেয়ারের পেছন হয়েই দাঁড়িয়েছিল, একটু বিস্মিত হয়েই মাথাটা ঘুরিয়ে প্রশ্ন করলাম—"মিটিং ! কোথায় ? কিসের মিটিং···তিনজনে মিলে !"

"কিসের মিটিন্ তা···"

কথাটায় একটা টান দিয়ে চুপ করে গেল। একটু সময় দিয়ে আবার প্রশ্ন করতে যাব, ও নিজেই আমতা-আমতা করে বলল—"একটা কথা বাবাঠাকুর··· যদি ভরসা দেন তো জিগ্যেস করি···"

বললাম—"কি কথা বল্ ; ভয়-ভরসার কি আছে এতে ?"

ঘুরে চেয়ে ওর কুণ্ঠাটা আর বাড়ালাম না; আস্তে আস্তে গড়গড়াটা টেনে যেতে লাগলাম।

"কথাটা হচ্ছে বাবাঠাকুর···জিগ্যেস করছিলুম—আমি এসে কি উৎপাত লাগিয়েছি এখানে?"

"উৎপাত!···উৎপাত লাগাবি কি!···হঠাৎ উৎপাতের কথা!···"

—খুব বিস্মিত হইনি বলেই মুখ থেকে নলটা সরিয়ে নিয়ে একটু ঘটা করেই শিউরে উঠতে হল। কদম সেদিকে খেয়াল না করে, আমার কথারও উত্তর না দিয়ে নিজের মনেই বলে যেতে লাগল—"উৎপাত যে লাগাইনি এমন নয়, উৎপাত না লাগালে তিনজনের গায়ে চিড়বিড়িনি ধরবে কেন? ঘণ্টাকে ঘণ্টা ধরে লুকিয়ে মিটিন্ হবে কেন? এখনও হচ্ছে বোধহয়, গেলে শুনতে পেতেন, তা আপনি তো মেয়েমানুষের মতন দোরের আড়াল হয়ে আড়ি-পেতে দাঁড়াতে পারবেন না।···অবিশ্যি আমিও যে জেনেশুনে আড়ি-পাততেই গেছলুম তা নয়—সে আপনি দিব্যি করিয়ে নিন, ওসব ছিঁচকেপনার ধার ধারি না—তবে ঘরে ঢুকতে যাব, কানে গেল নিজের নামেই কেচ্ছা হচ্ছে, একটু পড়তেই হল আড়াল হয়ে দাঁড়িয়ে।····সেই খানিকটা শুনতে হল। সহ্যি করা অব্যেস নেই, ইচ্ছে হল ঢুকে পড়ে তিনজনকে ভালো করে জানিয়ে দিই কাকে নিয়ে নাড়াচাড়া হচ্ছে; তারপর ভাবলুম—না, আগে বাবাঠাকুরকেই জিগ্যেস করি—তিনিও কি মনে করেন তাঁর ওপরও এসে উৎপাত লাগাচ্ছি? তা যদি হয় তো পত্রপাঠ বিদেয় হওয়াই ভালো···"

বললাম—"কথাটা কি বলবি, না, শুধু ভণিতাই করতে থাকবি?"

"তিনজনে মুখোমুখি হয়ে বসে কদমের ছেরাদ্দ হচ্ছে। খেয়েদেয়ে বাসনপত্রগুলো গোছগাছ করে রেখে মনে করলুম যাই, বাসায় গিয়ে একটু গড়াই গে—উদিকে কখন্ থেকে যে আরম্ভ হয়েছে জানিনে তো, বারান্দায় পা দিতেই কানে গেল—'তোমাদের কথা বলছ, আমি সোয়ামী, শাস্ত্রে বলে সোয়ামী দেবতা—বামন হলেই দেবতা হবে অন্য জাত হলে হবে না, এমন তো নয়—তা আমায়ই কি রেয়াত করে?'···একবার আস্পদ্দাটা দেখে রাখুন বাবাঠাকুর, যা-তা নয়, একেবারে দেবতা, উনি যাই হোন আর উঠতে বসতে

যত গণ্ডগোলই বাধান নিত্যি, ওঁকে কিছু বলতে পাবে না, দেবতার মতন পুজো করতে হবে !···তারপরেই বামনঠাকুরের গলা—'সোয়ামী, সে তো দেবতা আছেই, আমাদের স্বজাতি নয়, কিছু নয়, শুধু বয়সে বড় তুমি কানাইদা, তাইতেই বড় ভাইয়ের মতন কতটা খাতির করে চলতে হয়—আর বড় ভাই সেও তো এক হিসেবে দেবতাই—তা সেই সুবাদেই তো—বড় ভাইয়ের ইস্ত্রী, সেও গুরুজন বলেই তো এসেছে ইস্তক যদ্দুর সাধ্যি করে যাচ্ছি—তা দেখলে তো, মনিবের কাছে উলটে কেচ্ছাটা ? ঘর থেকে বেরুতে পারি না।'···জটাধারী ফোড়ন দিচ্ছেন—'একেই না বলে, যার জন্যে চুরি করি সেই বলে চোর। তুমি বললে, ভালো ঘরে মানুষ হয়েছে, তার পর জমিদারের মেয়ের সে একরকম সখী হয়েই রয়েছে—একটু ছিমছাম থাকতে ভালবাসে, তার ওপর দেখছি কানাইদার পরিবার বড় ভাজ সে গুরুতুল্যি—তাই-না। আসছে শুনে তাড়াতাড়ি খেটেখুটে ঘরটা ঠিকঠাক করে ফেললুম ; কোথায় চুন রে, কোথায় কী রে, মনে করলুম বারান্দাটাও একটু ঝেড়ে-ঝুড়ে সাজিয়ে-গুজিয়ে রাখি, দুটো ফুলের তোড়াও না হয় থাক না ঘরে—যতটুকু সাধ্যি করি, আমি তো বামনঠাকুরের মতন রেঁধে খাওয়াতে পারব না—তা দেখলে তো ব্যাভারটা, আর আমি ঘুরে চাইতে পারি এদিকে, না, হাজার সাধলে চাইব ?'···'আমিও কি আর এগুব না কি ?'—বামুনঠাকুর বলচেন আপনার। 'বড় ভাইয়ের পরিবার বলে খাতির করে যে এগিয়েছিলুম, সে তো শিকেয় তোলা থাক, এই যে একটা মানুষের বাড়তি রান্না, এই বা কেন করতে যাব আর ? দায়টা কিসের ? পষ্টই বলব বাবুকে আমার দ্বারা হবে না। জোর করেন, বলব তাহলে আমার হিসেব চুকিয়ে দিন। ইস্ত্রী নয়, এক পেয়াদা জুটিয়েছে কানাইদা !······তাও না হয় রেঁধে এক মুঠো ফেলে দিই, খা, পড়ে থাক, তাও তো নয়, অষ্ট পহর টিকটিক টিক,—শুক্তোর এ মশালা নয়, কোর্মা একে বলে না···তাহলে তুই-ই না হয় চোক হেঁসেলে।···উৎপেতে মানুষ কানাইদা, হদ্দ উৎপেতে ; কী করে যে ঘর করলে এতদিন···'

"দুজনে মিলে কানভাঙানি দেওয়ার ঘটাটা একবার দেখে রাখুন বাবাঠাকুর। একে তো ঐ রাসপাতলা মানুষ, সে যেদিকে নাকে দড়ি দিয়ে

ঘোরাচ্ছে, সেইদিকে ঘুরছে, তার ওপর ওসকানিটা দেখুন। বললেও তো; বলে—'আমাকেই কি কম নাস্তানাবুদটা করছে, দেখছই তো। তা আমি মরদকা বাচ্চা, ছুটো দিন দেখি একটু রাশ টেনে, না ঢিট হয়, চল শালী, যে নির্ব্বাসনে ছিলি আবার সেই নির্ব্বাসনে···'

"পারা যায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এরকম করে নিজের কেচ্ছা শুনতে বাবাঠাকুর? মনে হচ্ছে গায়ে যেন লঙ্কা বেটে মাখিয়ে দিচ্ছে। পা বাড়াব, একবার সামনাসামনি হওয়া দরকার মরদকা বাচ্চাদের সঙ্গে। হঠাৎ খেয়াল হল, আগে জেনে নেওয়া তো দরকার নির্ব্বাসনের মালিক যিনি তাঁরও কি এই মত? তা যদি হয় তাহলে আমার জোরটা কিসের? মানে মানে সরে পড়াই ভালো—"

চুপ করে চেয়ারের পেছনে দাঁড়িয়ে রইল; রায়টা কি বেরোয় শুনবে।

পাঁচ

আমার প্ল্যানটা যে এভাবে, আর এত শীঘ্র ফলে যাবে তা আশা করি নি। এখন শুধু নিতান্ত নির্লিপ্তভাবে,, বরং ওর ওপরই দরদ দেখিয়ে বলা—তিনজনে একজোট হয়ে পেছনে লেগেছে, এ-অবস্থায় পারবে কি টিঁকতে—মিছিমিছি অশান্তি বাড়ানো নয় শুধু?···

বুদ্ধিমতী আছে, বুঝে নেবে তাইতেই।

একটু সাজিয়ে বলতে হয়, সেবা যা করছে তাতে তো কোনও খুঁত থাকতে দিচ্ছে না। চুপ করে গড়গড়া টানতে টানতে ভাষাটা ঠিক করে নিচ্ছিলাম, কদম তাগাদা দিলে—"বাবাঠাকুর কিছু বলছেন না,—তাহলে কি পৌটলাপুটলি বাঁধব বাসায় গিয়ে?"

বললাম—"শোনা আর সঙ্গে সঙ্গেই গিয়ে পৌটলাপুটলি বাঁধতে হবে? তবে আমি ভাবছিলাম—তিনজনে একজোট হয়ে যদি লেগে থাকে পেছনে এই রকম করে···"

"তিনজন কি, ওরা আরও ডেকে নিয়ে আসুক না বাবাঠাকুর—তিনজনের জায়গায় তিরিশ জন আসুক না, আমি কি তোয়াক্কা রাখি ?"

নিজের প্রশ্নটা সাজাতেই ব্যস্ত ছিলাম, উত্তরটাও যে এই ধরনের হবে সেটা ভেবে দেখা হয় নি। তবে বড্ড কড়া করে ফেলেছে। সেটা বোধহয় টেরও পেয়েছে কদম; আবার কি ভাবে তুলব কথাটা ভাবছি, ও পাশ থেকে সরে এসে পেছনে হাত দুটো নিয়ে গিয়ে দরজার ঠেস দিয়ে দাঁড়াল, নিজেই বলল—"বাবাঠাকুর নিশ্চয় ভাবছেন—মেয়েছেলের মুখে এ কী ধরনের কথা! এমন মেয়েছেলেকে তো আগেই কুলোর বাতাস দিয়ে বিদেয় করতে হয়। তা তো নয়, আমি বলছিলুম আপনার যদি আপত্তি না থাকে, আপনি যদি মনে না করেন যে উপদ্রব হয়ে জুটেছি তো তিনজনই দাঁড়াক বা তিরিশজনই দাঁড়াক...তিনশ জনই দাঁড়াক না বাবাঠাকুর, আমার ভয় করবার কি আছে ? খেলাপ বলচি ?"

বললাম—"আমার যা কিছু তোর জন্যই ভাবনা; মেয়েছেলে, তায় একলা; নয়তো আর আপত্তি কিসের বল্ না ?"

গড়গড়া টানতে টানতে সন্তর্পণে একবার চোখ তুলে দেখলাম কদমের মুখে একটা কুণ্ঠার ছাপ, যেন নূতন কিছু ভাবছে। একটু থেমে বলল—"তাহলে যদি আর একবার ভরসা দেন তো একটা কথা বলি বাবাঠাকুর।"

বললাম—"কথা যা মনে আসবে বলবি বৈকি।"

"আমারই জন্তে ভাবনা যে বললেন সে আপনার দয়া; কিন্তু এখন আপনার দরকার নিজের জন্তেও একটু ভাবা...বয়েস হয়ে আসছে তো।"

হেসে বললাম—"ভাবছি না ?"

"মোটেই নয়।"

ও-সম্বন্ধে ঐটুকুই বলে কদম নিজের প্রসঙ্গে ফিরে এল, বলল—"আপনার এখন মেয়েছেলে—বেটাছেলে দেখলে চলবে না বাবাঠাকুর, আপনার শুধু দেখতে হবে, এই যে তিনটে অকর্মা জুটে আপনার এই রকম অবস্থা করেছে—সব থেকেও যেন একটা ছিরি-ছাঁদ নেই—তা এ-তিনটেকে বেশ সায়েস্তা করতে পারছি কিনা। অবিশ্যি একদিনে হবার নয়—সব মৌরসী হয়ে বসেছে তো, আপনাকে

শুধু দেখতে হবে গোড়াপত্তনটা হয়েছে কিনা। বাবুরা বুঝতে পেরেছেন কিনা যে আর ওরকম নবাবি চলবে না।"

বললুম—"তা তোর নজর আছে বৈকি চারিদিকে। তবে আমার কথা শুধু হচ্ছে—এরকম করে চারিদিকে শত্রু তোয়ের করে ফলটা কি ?"

"তাহলে কিছু যদি মনে না করেন তো আর একটা কথা বলি বায়াঠাকুর।"

"বল্ না, মনে করবার আর কি আছে ?"

"আমার বলাটা শোভা পায় না, ছোট মুখে বড় কথা হয়ে পড়ে, কিন্তু না বললে উপায়ও নেই,—আপনি মানুষের স্বভাব বোঝেন না। অবিশ্যি, আমি মন্দ মানুষদের কথা বলচি—ওদের স্বভাবই হচ্ছে যত ওদের টিপে রাখবেন ওরা ততই নিজেদের স্বভাব ভুলে কেঁচোটি হয়ে থাকবে, 'আলগা দিন, আবার যে-কে সেই। এই দুনিয়ার নিয়ম কিনা, সেই মান্ধাতার কাল থেকে চলে আসছে।"

আমার গড়গড়ার টান বন্ধ হয়ে গেছে, এতবড় একটা গুরুতর তত্ত্বকথা শুনে মুখ দিয়ে কথা বেরুচ্ছে না। কদম অল্প একটু হাসি নিয়ে মুখের পানে চেয়ে রইল, বলল—"আপনি কিছু ভাববেন না. বসে বসে শুধু দেখে যান। ওদের মুরোদ কতদূর আমার জানতে আর বাকি নেই। শত্রুতা করবে—তা ঐ আউট্-হাউসে বসে ল্যাজ নাড়া পজ্জন্ত। তাও বেশিদিন নয়। আপনাকে কিছু করতে হবে না, চুপ করে বসে দেখে যান। মতটা তো জানতে পারলুম আপনার।"

কিন্তু মতটা আর ভালো করে জানাতে পারলুম কই ?

কদম কায়েমী হয়ে বসল। আমিও ও-নিয়ে মাথাঘামানো একেবারে ছেড়ে দিলুম। ঠাকুর-মালীর কথা সব বলতে পারি না, কেন না এর পর কদম আউট্-হাউসের নূতন খবর যদি কিছু পেয়েই থাকে তো আমায় জানায় নি, বা জানানো প্রয়োজন মনে করে নি, তবে আমার নিজের চোখে যতটুকু পড়ে তাতে তো দেখি সেই তোষণ-নীতিই চলছে ওদের তরফ থেকে। রামকানাইয়ের সঙ্গে খিটিমিটি হয় বটে, তবে ওটা শাস্ত্রীয় ব্যাপার ; কবার দেখলামও তো, পরিণাম লঘু-ক্রিয়াই। জানি, যদি বলতে যাই—তবে আর কেন, উদ্ব্যস্ত করে তুলেছে তোমায় রামকানাই, না হয় রেখেই আসবে যেমন ছিল ?

সেই রকম হেসে বলবে—"ওর মধ্যে গভীর তত্ত্ব রয়েছে বাবু।"

নিজের কাজ আছে, চারিদিকে এত তত্ত্বকথা শোনবার অবসরও নেই, উৎসাহও নেই। গা এলিয়ে দিয়েছি।

•

কিন্তু মনে হল কদম একটা জিনিস যেন ধীরে ধীরে উপলব্ধি করতে আরম্ভ করছে—নিছক এতগুলি বেটাছেলের মধ্যে এভাবে থাকার অশোভনতাটুকু। অবশ্য এদের সঙ্গে আচরণে কোনো পার্থক্যই দেখা যায় না, তবে লক্ষ্য করেছি,—আমায় যদি একটু অবসরের মধ্যে পায়,—বেশির ভাগ, বিকেলে বারান্দায় ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে যখন গড়গড়া টানছি, নিজের অবসর না থাকলেও করে নিয়ে এসে বসে। বসে সংসারের কোনো একটা কথা নিয়ে—কি ফুরিয়ে এসেছে, আজ বাজারে কোন্ জিনিসটা কিরকম যাচ্ছে—কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই আমার বাড়ির কথা এনে ফেলে।

ভালো লাগে। সমস্ত দিনের খাটুনির পর এই সময় আমার মনটা অবসরের আলস্যে কল্পনাবিলাসী হয়ে পড়ে। মেয়েটা শুধু যে আমার অন্তরঙ্গ হয়ে পড়েছে তাই নয়, আমার কাছেই গল্প শুনে শুনে—খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে নিয়ে ও এখন দেশে আমার পরিবারের সবার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল—আমার ভাইয়েরা কে কোথায় থাকে, কি কাজ করে, আমার ভ্রাতৃজায়ারা, বোনেরা, ভাইপো-ভাইঝিরা নাতি-নাতনীরা, যারা নূতন আসতে আরম্ভ করেছে—কার কত বয়স, কি নাম, কি রকম প্রকৃতি, কি রকম দেখতে, মোটামুটি একটা পরিপূর্ণ চিত্র ও তোয়ের করে রেখেছে। সম্বন্ধও ফেলেছে পাতিয়ে। একটা অদ্ভুত দরদ আর অন্তরঙ্গতার সঙ্গে ওদের কথা এনে ফেলে।

"বাবাঠাকুর এখানে চুপ করে একলাটি বসে—বাড়ির সামনে খোলা জমিটায় এতক্ষণ সেখানে তাদের হুল্লোড়বাজি পড়ে গেছে।—বলছি, ওদের নিয়ে আসুন।....একসঙ্গে কেন?—সম্ভবও নাকি সেটা?—তবে একবার সেজ-মা এলেন যতগুলিকে পারলেন ঘেরেবুরে নিয়ে, দিনকতক রইলেন—তারপরে উনি গেলেন তো আর একজন এসে রইলেন, এই করে তো চলতে পারে! উদিকে সংসারেরও ক্ষেতি হয় না, ইদিকে আপনার এখানটাও খাঁ-খাঁ করতে থাকে

না।...আর মেয়েরাও শ্বশুরবাড়ি থেকে এসে যে ওখানেই থাকবে এই বা কি রকম কথা? ঘুরে যাক না একবার এখান থেকেও।...আসল কথাটা বলব বাবাঠাকুর? আমরা মেয়ে-জাতটাই ঐরকম—বাবা-বাবা, কাকা-কাকা আবদার সে ঐ যতদিন পরের ঘরে না যাচ্ছি ততদিনই, তারপর...”

গড়গড়া থেকে নলটা সরিয়ে একটু হেসে বলি—“তারপর কে কার খোঁজ রাখে, কি বলিস?”

“সত্যিই তো। মিথ্যেও বলছি না; ভয় করেও বলছি না। আসুন না দিদিমণিরা—মুখের ওপরই বলব আমি, কদম বড় ক্যাটকেটি, রেহাই নেই কারুর।—তবে হ্যাঁ, ওঁরা যদি বলেন—মেজকাকারই বা গা কোথায়? নিয়ে যাবেন তবে তো যাব। হ্যাঁ, তখন অবিশ্যি আমার মুখ বন্ধ হয়ে যাবে।... বাবাঠাকুরের বোধহয় ভয় করে...”

প্রশ্ন করি—“ভয়টা কিসের? তারা মেয়েই তো। আনা হয়ে ওঠে না নানা কারণে, তবে সে ভয়েই নাকি?...ভয়টা কিসের বল্ না।”

কদম শিউরে ওঠে—“ওমা ভয় নেই? নাতিগুলি যে এক-একটি খুদে ডাকাত হয়ে উঠছে!...” নাম করে করে কার ডাকাতির কি পদ্ধতি, কে কিভাবে আমার গৃহস্থালিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে কি ধরনের উপদ্রবটা লাগাবে মনে করিয়ে দেয়, তার মাঝেই হঠাৎ হয়তো বলে বসে—“আর তিনি—সেই আপনার শৌখীন নাতনীটি বাবাঠাকুর...বাগানের সবচেয়ে বড় ফুলটি মাথায় না গুঁজে দিলে যাঁর মন উঠবে না...”

বেশ লাগে। আমি কবিগুরুর গল্পের পোস্টমাস্টার, কদম যেন নিজেকে আমার বাড়ির সবার সঙ্গে একজন হয়ে বসে সময়ে অসময়ে এই করে সেখানকার ছিরিটি ফুটিয়ে ফুটিয়ে তোলে। নিজের অতীত থেকেও টেনে টেনে আনে। জমিদারের মেয়ে ওর কনকদিদিমনির গল্প। আহা, কত যে কথা তার, কী কষ্টটা যে মুখ বুজে সয়ে যাচ্ছে। তারপর ছেলেবেলার ওর সেই দাদুর বাড়ির কথা।

সে স্মৃতিতে ডুব দিলে কদম যেন আর উঠে আসতে চায় না। ছেলেবেলার কথা বলে আরও মিষ্টি তো। তা ভিন্ন আরও দূর অতীতের বলে কল্পনায় নিজেকে প্রসারিত করবার অনেকখানি অবসরও পায়।...বিশেষ করে রতনদার

কথা যদি উঠল। দাদুর তো তুলনাই হয় না, তা তিনি অনেকদিন হল মারা গেছেন, দাদুর পরেই আদর খেত রতনদাদার, যদিও সে আদরের মধ্যে পোড়ারমুখী, শয়তানী গালাগালও ছিল, চুলের মুঠি ধরে টানাও ছিল; অবশ্য দাদুর চোখ-কান এড়িয়ে…"

রতনদা পাঁচটা পাশ দিয়ে বসে আছে…

অনুযোগের স্বরে বলে ওঠে—"আরও এক ধনুর্ভঙ্গ পণ করে রেখেছে বিয়ে করবে না। তাই বলছিলুম—আপনার তোঁ বড় আফিস বাবাঠাকুর, একটা ভালো চাকরি দিয়ে নিয়ে আসুন না এখানে—দেখি করে কি না-করে বিয়ে। সে আমার অনেক মতলব করা আছে।"

রতনদাদার বোন খুকু—তখন তো একেবারে কোলে—ফুটফুট করছে—কদম যখন এল ছেড়ে তখন তো সবে দুটি দাঁত উঠেছে।

উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে—"এখন তো বড় হয়ে উঠেছে বাবাঠাকুর—তা ষোল-সতেরো হল বৈকি, নিন না, ভাইপোরা তো রয়েছে। আর নিয়ে এইখানে রাখুন। আমি রয়েছি, কিছু ভাবতে হবে না, আর আমি থাকলে এইরকম একটা না একটা ব্যবস্থা করবই বাবাঠাকুর, এখন থেকে বলে রাখছি, বাড়ি এমনি ফাঁকা থাকতে দোব নাকি? ইস্!…"

মুখ টিপে হাসে। কি হবে না হবে সে ভবিষ্যতের কথা, তবে গা এলিয়ে অলস কল্পনার ছবি এঁকে যেতে বেশ লাগে—বাড়ির সঙ্গে ওর দাদুর বাড়ি মিলিয়ে—এই নিরালা প্রবাসজীবনকে পূর্ণ করে।…তারই মধ্যে কনকমণি তার করুণ চোখ দুটি নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে।

ক্রমে অবস্থাটা এমন হয়ে গেল যে ওকে সরাবার কথা ভাবব কি, ও যেন অপরিহার্য হয়ে উঠল আমার কাছে। আফিস থেকে এসে হাত-পা ধুয়ে কিছু জলযোগ করে এই বারান্দাটিতে আরাম-কেদারায় গড়গড়া নিয়ে বসব, কদম কোনও একটা কথা জিজ্ঞাসা করবার ছুতো করে এসে আটকে যাবে, বাড়ির কথা তুলবে, সঙ্গে হয়তো ওর দাদুর বাড়িরও—এটা যেন একটা নেশা হয়ে উঠতে লাগল। কদম যদি না আসে কোন কারণে তো আমাকেই কোন একটা ছুতো

করে ডেকে নিতে হয়, যদি না তুলস বাড়ির কথা তো আমারই খেই ধরিয়ে দিতে হয়।

এসেছিল যেন একটা দুঃস্বপ্ন, এখন সেই কদম না হলে দিনটা যেন একেবারে ফাঁকা বোধ হয়।

ছয়

কিন্তু যা বলছিলাম, কদম ভেতরে ভেতরে একটা অস্বস্তির মধ্যেই কাটাচ্ছিল। বেশ গুছিয়ে-গাছিয়ে বসবার জন্য ওদের তিনজনের যেটুকু বিরোধিতা করা দরকার পড়ল তা করল, আমার অনিচ্ছাও উঠল কাটিয়ে, কিন্তু এটাও দিন দিন অনুভব করতে লাগল যে, এতগুলা পুরুষের মধ্যে একা মেয়েছেলে—এটা যেন বেশ মানানসই হচ্ছে না।

অবশ্য স্পষ্ট বলবার মেয়ে নয়, ঐ আলাপ-আলোচনার মধ্যে দিয়ে যতটুকু বের করে নিতে পারি। তা এক একদিন গল্পচ্ছলে ওসকানিও এসে পড়েছে—"কেন, আপনিও তাহলে এক কাজ করুন বাবাঠাকুর—একটি ভাইঝির বিয়ে দিয়ে কাছেই রাখুন জামাইকে ঘরজামাই করে।"

হেসে বলি—"জব্দও হয় ওরা।" আলোচনা ওসকানি আমি হালকাভাবেই করি, কিন্তু কদমের পক্ষে এটা তো একটা সমস্যাই। আকারে-ইঙ্গিতে কিছু না জানতে দিলেও ভেতরে ভেতরে উপায় খুঁজছিল, এবং আমি টের পেলাম যখন সমস্যাটার ও একটা পাকারকম সমাধান করে বসল। সমাধানটি যেমন অপ্রত্যাশিত তেমনি অমোঘ। কদমের সঙ্গে পারিবারিক আলোচনা প্রসঙ্গে আমি অনেক সময় যারা আপন, যারা খুব নিকটের তাদের ছাড়িয়ে অনেক দূরে গিয়ে পড়তাম। এ-আলোচনাগুলা হত অলস ভাবালুতার ঘোরে, তাই এমনও হয়েছে, যার সঙ্গে নিকট-দূর কোনও সম্পর্কও নেই এমন মানুষও আলোচনার মধ্যে এসে ঢুকে পড়েছে। এর মধ্যে একজন ছিলেন হরি-মাসীমা।

হরি-মাসীমার সঙ্গে নিকট-দূর কোনো সম্পর্কই ছিল না—যা ধরে মাসী-বোনপো সম্বন্ধ গড়ে উঠতে পারে আমাদের। পরিচয়ও অল্প সময়ের জন্য, আট

ঘণ্টার মধ্যেই শেষ হয়ে যায়। হয়তো এতটাও ছিলেন না। কিন্তু সময়টা এমন ছিল এবং অনেকটা সেইজন্যেই মনের এমন একটা তন্ত্রী স্পর্শ করে যান ঐটুকুর মধ্যে যে নিবিড় আত্মীয়তায় প্রায় মায়ের পাশেই তারপর থেকে আমার অন্তরে একটি আসন নিয়ে রয়েছেন। অনেক পূর্বের কথা, মায়ের মৃত্যুর পর তাঁর জন্মস্থান দেখবার ইচ্ছা জাগে মনে। মার্টিন রেলের একটি অল্প পরিচিত স্টেশনে নেমে মাইল দুই হেঁটে আমরা বাড়ি পৌছলাম। গেছি প্রায় বিশ বছর পরে। অনেক পরিবর্তন, মামাদের বাস উঠে গেছে, তাঁরা এখন শহরে, উঠেছি তাঁদের এক আত্মীয়ের বাড়ি। মা নেই, এমনি চারিদিকে এক অপরিসীম রিক্ততা, তার ওপর এই অবস্থা, বিষণ্ণ মনে অতীত আর বর্তমান নিয়ে অল্প-স্বল্প আলোচনা চলছে, এমন সময় একজন প্রৌঢ়া এসে উপস্থিত হলেন। মামাদের আত্মীয়, জ্ঞাতি-মামাই বলি—তাঁকে প্রশ্ন করলেন—"হরি, চিনতে পার? দেখ তো ভালো করে।"

প্রৌঢ়া এগিয়ে এসে মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। চেনা সম্ভব নয়, জ্ঞাতি-মামা পরিচয়টা দিয়ে দিলেন।

"ওমা গিরির ছেলে—মেজ ছেলে! তা কি করে চিনব, সেই কবে দেখেছি এতটুকু, সে কি আজকের কথা!"

সম্বন্ধের দিক দিয়ে কেউ নয়, মায়ের বাল্য-সঙ্গিনী। মা ছিলেন বাড়ির প্রথম সন্তান, কাছাকাছি আত্মীয় ভাই-বোনদেরও সবার দিদি—আমার সেদিন সবচেয়ে বিস্ময়কর মনে হয়েছিল এখনও এমন একজন বেঁচে রয়েছেন যিনি মাকে গিরি ব'লে ডাকবার অধিকারিণী। একটি শব্দের মধ্যে অমন অপূর্ব মিষ্টাস্বাদ আর জীবনে কখনও পাই নি। আর, কেউ না হয়েও কি অপূর্ব মিল দুজনের চেহারায়। —বর্ণে, গঠনে, মুখের ডৌলে; কী করে হয় এটা! প্রণাম করে উঠতে কি রকম একটা মুগ্ধ দৃষ্টি নিয়ে চিবুক স্পর্শ করে হাতটা চুম্বন করলেন, তাঁর মুখেও একটু বিস্মিত হাসি।

তারপর প্রায় পনেরো বৎসর কেটে গেছে, মামার বাড়ির পাট উঠে যাওয়ায় ওদিকে আর যাওয়াও হয় নি, হরি-মাসীর সঙ্গে দেখাও হয় নি। তাঁর সম্বন্ধে আলোচনারও আর কোন অবসর হয় নি, এখন কদমের সঙ্গে নিজের যারা তাদের

সম্বন্ধে অলস আলোচনা-প্রসঙ্গে আবার হরি-মাসী ফিরে এসেছেন। আর ফিরে এসেছেনও ভালো ভাবেই ; অনাত্মীয়, তায় এত নিকট, ওঁর কথায় আমি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছি। প্রসঙ্গটা আমার প্রিয় জেনে কদমও ওঁর কথাই ইদানীং বেশি করে তুলত। স্মৃতির মূলধন অল্প, কিন্তু তাই নিয়েই আমাদের আলাপ খুব জমে উঠত। হরি-মাসী ছিলেন বিধবা, নিঃসন্তান ; ভাইয়ের বাড়িতে থাকতেন তখন। ওঁর সম্বন্ধে জানা ছিল এইটুকুই, এরই চারিদিকে আমাদের কল্পনা মুখর হয়ে উঠত।

কদম হয়তো বলল—"রক্তের সম্বন্ধ থাকলেই যে খুব আপনার হবে, স্নেহের সম্বন্ধটা কিছু নয়, এমন কি কথা আছে বলুন ? মায়ের সই, সে সহোদর বোনের চেয়ে কিছু কম নয় তো। অন্য কেউ হলে অমন করে আপনার মুখে হাত বুলিয়ে চুমো খেতে পারত ?— যেন কচি ছেলেটি।...আপনার বয়েস তখন কত বাবাঠাকুর ?"

বলি—"তা হয়েছে বৈকি, বছর পনেরো হতে চলল—প্রায় ছাপান্ন যাচ্ছে এখন।"

"ছাপান্ন থেকে পনেরো গেল, তবু কিছু নয় তো চল্লিশ-একচল্লিশ বছর। তেমনি স্নেহ না হলে, নিজেরটি বলে মনে না হলে পারে কেউ কখনও ?"

"আর সে যে কী মিষ্টি—বাছা !"

"হবেই তো। মার সই, সে মার থেকে তো আর আলাদা নয়।"

কোনদিন প্রসঙ্গটা অন্য আকারে ওঠে। কদম বলে—"এখন হরি-দিদিমা কোথায় আছেন, কিরকম আছেন কে জানে ! দাদার সংসারে ছিলেন, তাঁরই বা এখন কি খবর..."

এক কথাতেই বেশ একটু দুশ্চিন্তার পরিমণ্ডল সৃষ্টি করে নেয়। বলি—"হ্যাঁ, আর দাদা, তিনি তো নিতান্ত দু-এক বছরের বড় নয়। তিনিই ছিলেন সবচেয়ে বড়, হরি-মাসীমা শুনেছিলাম বাপ-মায়ের ন সন্তান ছিলেন—মেজো, সেজো, তারপর। কম করে ধরলেও বছর ছয়েকের তফাত তো বটেই। ...তারপর দেশে ম্যালেরিয়ায় মরে যেমন উজকুর হয়ে যাচ্ছে, বুড়ো মানুষ আর কোথায় ?"

"হরি-দিদিমাই আছেন কিনা কে জানে।...একটু যদি খবর পাওয়া যেত না বাবাঠাকুর ?"

বলি—"তা ইচ্ছে কি হয় না খবর নিতে? কিন্তু দেখছিসই তো কাজের চাপ, টেবিল থেকে মাথা তোলবার ফুরসত হয় না···"

"ওমা, তা আর দেখচি না! নাকের নীচে কি হচ্ছে, না-হচ্ছে সেদিকেই যাঁর নজর দেওয়ার সময় ছিল না—পাঁচভূতে লুটেপুটে খাচ্ছে ···"

এ কথাটা একটু সুবিধা পেলেই কদম তুলে বসে আজকাল। ও যে আমার পক্ষে কতটা প্রয়োজনীয় মনে করিয়ে দেয়। আমিও একটু ঘুরিয়ে স্বীকার করেই নিই, একটু হেসে বলি—"সে দিক থেকে তো নিশ্চিন্দি হয়েছি, ভগবান এমন রোজা জুটিয়ে দিয়েছেন যে ভূতের দল ঠাণ্ডা, কিন্তু সাধ করে বা কর্ত্তব্যই মনে করে যে কারুর খোঁজ নেবে লোকে তার জন্যে চৌহদ্দির বাইরে পা দিতে হবে তো, তা বছর ঘুরে গেল বাড়িই কবার যেতে পারছি বল্।··· থাক্ এসব দুঃখের কথা, অন্য কথা তোল্।"

ও-দুঃখটা আর আমার থাকতেই দিল না কদম। সামনেই শিবরাত্রির দুদিনের ছুটি, একরকম জোর করেই উদ্যোগী হয়ে আমার বাড়ি যাওয়ায় ব্যবস্থা করে দিল। বাড়ি যে এতদিন যাই নি তার কারণটা সত্যিই যে অবসরের অভাব এমন নয়। কতকগুলা অপদার্থ চাকর-বাকরের হাতে পড়ে আমিও কিরকম যেন জবুথবু হয়ে যাচ্ছিলাম—ছুটিছাটা অল্পবিস্তর আছে, মনটাও থাকে বাড়িতে পড়ে, কিন্তু তোড়জোড় করে আর এদের হাতে গৃহস্থালি ছেড়ে নিশ্চিন্ত হয়ে কোথাও যেতে না থাকত উৎসাহ, না হত সাহস। ফলে এমন অবস্থায় যেমন হয়, সামনে কোন ছুটি এলে এবার ঘুরে আসতে হবে প্রতিবারই সংকল্প করতাম মনে মনে, তারপর পরিবর্ধিত আলস্যের মধ্যে কোথা দিয়ে যে ছুটির দিনগুলো কেটে যেত টেরও পেতাম না। এই গেছে প্রায় বছর খানেকের ইতিহাস।

এবার কদমের উৎসাহে এবং কদম আছে বলে নিশ্চিন্ত হয়ে, শিবরাত্রির ছুটির সঙ্গে আরও দিন তিনেকের ছুটি নিয়ে নিলাম। কদমের ফরমাশ রইল বাড়ি থেকে যেন কাউকে নিয়ে আসি দিন কয়েকের জন্য।···যেন নিশ্চয় নিয়ে আসি। এ কী কাণ্ড! সবাই রয়েছে, অথচ বিদেশ-বিভূঁয়ে চিরকালটা এরকম একা-একা কাটাতে হবে—এ কদমের ভাল লাগে না। তাহলে তো বাড়ি গিয়ে বসলেই পারি

—একা মানুষ, তার এরকম মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রোজগারের জন্তে বাইরে পড়ে থাকবার দরকারটাই বা কি ?

বেশ গার্জেনের মতো খানিকটা বুঝিয়ে খানিকটা মৃদু তিরস্কার করে আমায় বাড়ি পাঠিয়ে দিল, হয়েও পড়েছে খানিকটা গার্জেনের মতোই তো। নিয়ে আসবার ইচ্ছাও ছিল কাউকে। স্নেহ-মমতা, আদর-যত্নের মধ্যে নিঃসঙ্গ জীবনটা কাটাবার একটু লোভ ধরিয়ে দিয়েছে কদম, কেউ না হয়েও ও যখন এতটা, তখন যারা নিতান্তই আপন, যাদের সঙ্গে স্নেহ-মমতা-শ্রদ্ধার সম্বন্ধটা সহজ এবং স্বাভাবিক তাদের সঙ্গ-লিপ্সাটা নূতন করে এনে দিয়েছে। নিয়ে আসতাম, কিন্তু যাগাযোগ হয়ে উঠল না কোনমতেই।

এসে দেখি কদমও বসে ছিল না চুপ করে।

আমি যখন ফিরলাম তখন বিকেল হয়েছে। বাইরের রকে পড়ন্ত রোদে একটা ইজিচেয়ার বিছিয়ে নিয়ে রামকানাইকে তামাক দিতে বলে শরীরটা এলিয়ে দিলাম। জটাধারী চটিজুতো এনে জুতো-মোজা খুলতে লাগল।

ঠাকুর এসে কি জলখাবার করবে জেনে নিয়ে গেল। রামকানাই তামাক সেজে নিয়ে এসে গড়গড়ার নলটা পাশ থেকে হাতে তুলে দিয়ে গেল। চুপ করে টানতে লাগলাম। খানিকটা সময় নিঃশব্দে কেটে গেল।

কিন্তু কদম কোথায় ? একটা থমথমে ভাব রয়েছে তাতে মনে হয় নূতন একটা কিছু যেন হয়েছে বাড়িতে আমার অনুপস্থিতিতে।

কদম চলে যায় নি তো ? কাউকে জিগ্যেস করতে পারছি না তার কারণ খবরটা আমার পক্ষে ভালো হবে কি মন্দ হবে, ঠিক যেন বুঝে উঠতে পারছি না। …ভালো খবরের প্রত্যাশাটা মিষ্ট, তাই মানুষ শুনে ফেলে সেটুকু নষ্ট করতে চায় না ; মন্দ খবরের আশঙ্কাটা বেদনাময়, তাই মানুষ শুনে ফেলে সে আশঙ্কাটাকে সুনিশ্চিত করে ফেলতে চায় না। আস্তে আস্তে তামাক টেনে যাচ্ছি।

একটা ছায়া পড়ল এবং আড়চোখে চেয়ে দেখবার সঙ্গে সঙ্গে কদম পেছন থেকে একটু সামনের দিকে এসে গলায় আঁচল জড়িয়ে প্রণাম করল। উঠে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করল—"বাড়ির তাদের খবর সব ভালো তো বাবাঠাকুর ?"

উত্তর দেবার আগেই অনুযোগটাও জুড়ে দিল—"কই, নিয়ে এলেন না তো কাউকে এবারও!"

বললাম—"নিয়ে আসব মনে করলেই তো নিয়ে আসা হয় না বাছা; এবার আবার মেয়েগুলো সবাই তাদের শ্বশুরবাড়িতে।"

একটু হেসে বললাম—"আর কি জানিস? —সবার টান এখন উল্টো দিকে।"

মনে হল কদম যেন এই ধরনেরই একটা কথার অপেক্ষায় ছিল। আমার হাসিতে যোগ দিল না, বরং একটু বেশি গম্ভীর হয়েই উত্তর করল—"এ যা বলেছেন, লাখ টাকা দামের একটা কথা, টান থাকা চাই। নৈলে সম্বন্ধটা দেখতে গেলে তো কিছুই নয়—নিজের মাসী তো নয়ই, এমন কি দূর সম্পর্কেরও কেউ নয়—কী না মায়ের সই, ছেলেবেলা একসঙ্গে খেলা করেছেন, তাঁর গিয়ে…"

"হরি-মাসীর কথা বলছিস?" —নিঃসন্দিগ্ধ ভাবেই প্রশ্ন করলাম।

কদম বলল—"তিনি নিজে হলেও তো কথা ছিল—ছেলেবেলার সুবাদে একটা টান এসেই যায়। তাঁর বোন….বড় বোন…"

কথাটা একটু খাপছাড়া ঠেকছে যেন, সটকা থেকে মুখটা সরিয়ে প্রশ্ন করলাম—"তাঁর কথা তুই টের পেলি কোথা থেকে? হরি-মাসীর বড় বোন যে আছেন আমি তো তাও জানি না।"

কদম বলল—"থাকতে বড় বোনই আছেন, হরি-ঠাকরুনমা তো বেঁচে নেই। এসব তত্ত্ব আমিই কি জানতুম? —জান্ নই তো, ওঁর মুখেই শুনলুম—"

বেশ বিস্মিত হয়ে গেছি, মেয়েটা যে অঘটনঘটনপটীয়সী সে কথাটাও ততক্ষণে খেয়াল হয়েছে, দিন চারেক ছিলাম নাও তো; বেশ বিমূঢ়ভাবেই প্রশ্ন করলাম—"কিন্তু পেলি কোথায় তাঁকে তুই? গিয়েছিলি নাকি সেখানে?"

একটুও বিচলিত হল না কদম, অল্প একটু হেসে বলল—"বাবাঠাকুর একটু ভেবে কথা বলেন না। সেখানে যাব কি করতে, আর কি করেই বা যাব? মনে করলুম—পাপের শরীর তো, কপালগুণে বাবা তারকেশ্বরের দোরের এত কাছে যখন এবার, শিবরাত্রির ব্রতটা না হয় তাঁর ওখানেই গিয়ে সেরে আসি। সেই আপনার নফরকে সঙ্গে নিয়ে গেছলুম। সেখানে হবি তো হ—হঠাৎ দয়া-ঠাকরুনমার সঙ্গে দেখা, বাবার মহিমের তো বুলকিনেরা নেই—তারকেশ্বরে

শিবরাত্রি, বাবাঠাকুর—বোধ হয় লক্ষ লোক একত্র হয়েছে, তার মধ্যে বেছে বেছে ঠিক দয়া-ঠাকরুনমা···ওঁর নাম যেমন হরি, এর নাম তেমনি দয়া কিনা—তা সেই লক্ষ লোকের মধ্যে থেকে···"

মনে হল রামকানাই যেন দরজার আড়ালে ওত পেতে দাঁড়িয়ে সব শুনছিল, আধখানা বেরিয়ে এসে বলল—"বুড়ো-ঠাকরুনমা উঠলেন ঘুম থেকে, তোকে ডাকতেছেন।"

"এই আসি"—বলে ঘুরতেই অতিমাত্র বিস্ময়ে আমার হাতটা আলগা হয়ে সটকাটা পড়ে গেল ; প্রশ্ন করলাম—"তিনি এখেনে!"

অবিচলিত ভাবেই কদম এসে সটকাটা তুলে দিল আমার হাতে ; বলল—"তবে আর টানের কথা বলছি কি বাবাঠাকুর? গিরির ছেলে এত কাছে রয়েছে আর আমি পোড়াকপালী দেখতে পাব না, কবে আছি কবে নেই—নিয়ে চল্ একবার আমায় তার কাছে, সে যে কী ব্যাগ্যতা বাবাঠাকুর—আমি যত বলি ··"

কথাটা থামিয়ে একটু ব্যস্ত হয়েই ভেতরের দিকে চেয়ে বলে উঠল—"আপনি নিজে উঠে এলেন কেন? আমি আসছিলুমই।"

এগিয়ে গিয়ে হাত ধরে একটি বৃদ্ধাকে সামনে এনে দাঁড় করাল। বয়স চুয়াত্তর-পঁচাত্তর হবে। মাথাটা একেবারে সাদা। একটু নুয়ে গেছেন কিন্তু তবু মনে হয় বেশ শক্ত। চোখের দৃষ্টি মনে হয় একটু বেশী ক্ষীণ, আর হাতদুটো একটু একটু কাঁপছে। জিগ্যেস করলেন—"গিরির ছেলে এয়েচ ফিরে?"

গলাটাও একটু কাঁপা। আমি বিমূঢ়তার ভাবটা কাটিয়ে উঠে গিয়ে প্রণাম করলাম, বললাম—"আজ্ঞে হ্যাঁ, এই যে।"

কদম হেসে বলল—"তবেই হয়েছে। কানের কি কিছু আছে?"

আমি আবার গলা চড়িয়ে বললাম কথাটা, তারপর রামকানাইকে উদ্দেশ্য করে একটা চেয়ার এনে দিতে আদেশ করলাম। কদম আবার একটু হাসল, বলল—"হ্যাঁ, ঠাকরুনমা আমাদের মেমসাহেব কিনা, চেয়ারে বসবেন সামনা-সামনি হয়ে! চাকরও বুদ্ধির ঢেঁকি, চললেন আনতে!"

তাড়াতাড়ি ভেতর থেকে একখানা কম্বল এনে চারপাট করে আমার সামনে

পেতে দিল, বলল—"বসুন। বোনপোর সঙ্গে গল্প করুন, আমার কাজ রয়েছে, দেখিগে একটু।"

প্রণাম করে উঠতে বৃদ্ধা আমার মাথায় হাতটা বুলিয়ে চিবুকটা ধরে আমার মুখটা তুলে সস্নেহে নিরীক্ষণ করছিলেন, কম্বলটা পাতা হলে বসতে বসতে বললেন —"সেই কবে দেখা, তখন এতটুকু, মনে কি আছে? ···মেয়েটি আমায় বললে···"

কদম ফিরে এল, যেন মস্ত বড় একটা ভুল করে বসেছিল, ওঁর কথার মাঝখানেই একটু হেসে বলল—"যখন যেটা হবার কেমন আপনি হয়ে যায় দেখুন না; অবিশ্যি বাবার ধাম বলেই আরও হল। নৈলে একই দোকান ঘর ভাড়া করে একদিকে উনি, তারই অপর দিকে আমরা দুজন।··· যে যার ধান্ধা নিয়ে রয়েছি—হঠাৎ কানে গেল—বেলে-প্রতাপপুর—ওঁদের মধ্যে কে যেন কথাটা বললে —শুনতেই কান দুটো খাড়া হয়ে উঠবে তো? ওমা, বেলে-প্রতাপপুর কিগো! সে যে আমাদের বাবাঠাকুরের মামার বাড়ি। আর দ্বর সয়? —ঘরের এ-কোণ ও-কোণ তো, এগিয়ে গিয়ে জিগ্যেস করলুম—'হ্যাগা, আপনারা বেলে-প্রতাপপুরের কথা বলছ, তা সেখানকার গিরি-ঠাকরুনকে চেন?'··· প্রথমটা কেউ ধরতে পারে না···কোন্ গিরি-ঠাকরুন? তারপর একথায় সে-কথায় প্রকাশ হয়ে পড়ল—ঠাকরুনমাই বললেন—'রসিককাকার মেয়ে গিরি, তাই বল, তাকে চিনব না? গিরি আর আমাদের হরিমতী ছিল দুটি দেহে একটি প্রাণ। গেলও তেমনি; তারপর বছরও ঘুরতে পেল না···'

কাঁদতে লাগলেন, তখন আমি বললুন—'গিরি-ঠাকরুনের ছেলে তিনি তো কাছেই রয়েছেন—হরি-মাসীমার নাম করতে অজ্ঞান। তখন একেবারে হেদিয়ে পড়লেন—'যখন শুনেছি, একবার দেখতেই হবে, গিরির ছেলে, সে হরিমতীরই ছেলে, দুজনে তো আলাদা ছিল না···"

সাত

শুধু একবার দেখা করা নয়, একদিন একদিন করে দুটো সপ্তাহ কেটে গেল, দয়া-মাসীমার নড়বার নাম-গন্ধ নেই। নিজেও করেন না, কদমের মুখেও কোন উচ্চবাচ্য নেই। বেশ দুশ্চিন্তার কথা হয়ে দাঁড়াল।

আমি চাকর-বাকর সম্বন্ধে খানিকটা বেহুঁশই ছিলাম। একমুঠো করে খেতে পাই, দরকার পড়লে গড়গড়ার নটকাটা হাতে এসে ওঠে, শোবার সময় হলে বিছানাটা পাতা থাকে—এই ছিল তাদের অস্তিত্বের প্রমাণ; অফিসের কাজ থেকে ফুরসত নেই, এর বেশি প্রমাণের দরকারও ছিল না আমার। কদমের ব্যাপার থেকে, ওর আসবার সূচনা থেকেই নিতান্ত আকস্মিকভাবেই আমি টের পেলাম যে চাকর-বাকর নিয়ে একটি পুরোপুরি জগৎ উপগ্রহের মতো আমার চারদিকে পাক খেয়ে বেড়াচ্ছে—একটা জটিল জগৎ, যেখানে বিশেষ করে আমার আই-বুড়ত্বের সুযোগ নিয়ে প্রতিনিয়ত চক্রান্ত চলছে। কদম এসে পড়তে যে সব ব্যাপার আরম্ভ হল তাতে উপগ্রহ সম্বন্ধে আমায় আরও সজাগ করে তুলল, এখন অফিসের কাজ বাড়িতে এসে উঠবে কি, এদের নিয়ে দুশ্চিন্তাটা অফিস পর্যন্ত গিয়ে ঠেলে উঠেছে।

আমায় এখন ভাবতে হয়, এবং তাই থেকে একটা সুফল এই হয়েছে যে, আমি এখন খানিকটা খানিকটা ভাবতে পারি, কিছু কিছু যেন পড়ে ধরা আমার কাছে।

যেমন, বুঝতে পারছি দয়া-মাসী নিয়ে সমস্ত ব্যাপারটাই কদমের একটা গূঢ় চক্রান্ত। উদ্দেশ্যটা হয়তো খারাপ নয়; গুছিয়ে বসেছে, কিন্তু একা মেয়েছেলে—বেশ যে বেমানান হচ্ছে এটা যদি বুঝতে পেরে থাকে তো যুক্তিটা ওর স্বপক্ষেই যায়। আমি আশ্চর্য হচ্ছি ওর বুদ্ধির দৌড় দেখে। তারকেশ্বরে হরি-মাসীর শিবরাত্রির ব্রত-উপলক্ষে আসবার একটা সুদূর সম্ভাবনা আছে। ও আমায় সরিয়ে দিয়ে রামকানাইকে সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত হল সেখানে। তারপর ওর কথাই ধরা যাক, লক্ষ মানুষের মধ্যে ও খুঁজে বের করেছে—হরি-মাসী নেই, তার

জায়গায় তাঁর বোনকে বের করা নিশ্চয় আরও শক্ত হয়েছে ; কিন্তু ছাড়ে নি ও। তারপর টেনে নিয়ে এসেছে এখানে। ইউরোপ কি আমেরিকায় জন্মালে এ-মেয়ে কি করত!

ওর-পাল্লায় পড়ে পড়ে আমার বুদ্ধি খুলেছে একটু একটু করে, বুঝি ওর চক্রান্ত, শুধু সমস্তটা বুঝি সে ক্ষমতা এখনও আয়ত্ত হয় নি।

প্রথমত, কি বুঝিয়ে ওঁকে এখানে এ-ভাবে টেনে তুলল ?—যেমন দেখছি, একরকম কায়েমী ভাবেই। দ্বিতীয়ত, যে কুটিল সন্দেহটা একটু ফাঁক পেলেই মনে হানা দিচ্ছে—সত্যিই হরিমাসীর বোন দয়ামাসীই তো, না, অন্য কাউকেও শিখিয়ে পড়িয়ে হাজির করল কদম নিজের নিঃসঙ্গতা ঘোচাবার জন্য ? লক্ষ মানুষের মধ্যে থেকে দয়া-মাসীকে খুঁজে বের করার চেয়ে সেইটেই যেন ঢের সহজ আর স্বাভাবিক বলে মনে হয়। মুশকিল হয়েছে রহস্যটা কোনমতে উদ্ঘাটন করতে পাচ্ছি না। আসল ভেতরের কথাটা কি তাতে পৌছুতে হলে দয়া-মাসীর সঙ্গে একটু আলাদা কথাবার্তা চালানো দরকার। কিন্তু দেখছি, কদম এমন ঘেরেঘুরে থাকে যে একটু ফাঁক রাখে না ওঁর সঙ্গে দুটো কথা কইবার। তা ভিন্ন কালা মানুষ, ওঁকে কিছু জিগ্যেস করতে যাওয়া মানে সমস্ত পাড়ায় তার নোটিস ছড়িয়ে দেওয়া। সে দিক দিয়েও কিছু হয়ে ওঠে না।

শেষ অবধি দাঁড়ায়, কদম যা বলে তা ধ্রুব সত্য বলে মেনে নেওয়া। তাই করতে হল—; এইভাবে চলল।

কিন্তু সুখের বিষয়, বেশিদিন এই অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকতে হল না। দয়া-মাসী মানুষটি নির্ঝঞ্ঝাট। বাঙালী বিধবার শুচি-বাইটা আছে, তাই নিয়ে এবং জপ-তপ নিয়ে খানিকটা আলাদাই থাকেন। আমার ফুরসত নেই বা অন্তরের কোন তাগিদ নেই যে কাছে বসে আলাপ করি, কদমেরও ইচ্ছা নয় যে উনি এসে করুন, তবে আমি খাবার সময় উনি যেন নিজের মনেই হঠাৎ একদিন এসে সামনে বসলেন, দিন দু-এক বাদ দিয়ে আর-একদিন, তারপর আর-একদিন। বসে একটু একটু করে মামার বাড়ি নিয়ে, বিশেষ করে মায়ের শৈশব নিয়ে নিজের মনেই এমন সব কথা বলে গেলেন যাতে এটা বেশ স্পষ্ট হয়ে গেল আমার কাছে যে কদম যেভাবেই এবং যে উদ্দেশ্যেই ওঁকে এখানে টেনে তুলুক, ব্যাপারটার

মধ্যে কোন ভণ্ডকতা নেই, অর্থাৎ দয়া-মাসী সাজানো দয়া-মাসী নয়। কদম কাছে বসে থাকে, সতর্কও থাকে, সুতরাং কিভাবে এলেন, কেন এলেন এটা প্রকাশ পায় না; তবে মাসীত্ব সম্বন্ধে সন্দেহটা কেটে যেতে ওদিককার কৌতূহলটা আমার ক্রমে ক্রমে মরে গেল। আর একটা জিনিস ঐ কতকটা অসংলগ্ন কথাবার্তার মধ্যে লক্ষ্য করলাম—সত্যই গিরির পুত্র হিসাবে আমার প্রতি ওঁর অন্তরে একটি স্নেহের ফল্গু আছে এবং সেটি দিনদিনই যেন পুষ্ট হচ্ছে ধীরে ধীরে। খুব বেশি কিছু যে বলেন এমন নয়—হয়তো মায়েরও বড় বোন হিসেবে একটু উপদেশ; হয়তো আহারের অল্পতা নিয়ে মায়ের সঙ্গে একটু তুলনা, একটু অনুযোগ —সেই গিরিরই ছেলে তো, বললে শুনবে কেন? সামান্যই সব, কিন্তু এত মিষ্ট লাগে, আর, এই বয়সে এত দুর্লভ মনে হয় যে আর সন্দেহের অবকাশই থাকে না যে এ-জিনিস একেবারেই খাঁটি, একেবারেই নির্ভেজাল।

মাস তিনেক কেটে গেল। ধীরে ধীরে অনুভব করতে লাগলাম আমার সংসার একটি বেশ নূতন রূপ নিয়েছে। মায়ের জায়গা নিয়েছেন দয়া-মাসী, মেয়ের জায়গা কদম নিয়েই ছিল, দয়া-মাসী আসার পর ওঁর সাহচর্য এবং সমর্থন লাভ করে আরও যেন পাকা করে নিয়েছে জায়গাটা। এখন একদিকের স্নেহ আর একদিকের সেবায় এক অপূর্ব পূর্ণতার মধ্যে দিয়ে দিনগুলা কেটে কেটে যাচ্ছে আমার।

কৃতিত্বটা কদমের। সে দুশ্চিন্তা হয়ে দেখা দিয়েছিল, তারপর দুর্লভ করে তুলল নিজেকে। দয়া-মাসীকেও সেদিন হাজির করল, ভেবেছিলাম এ আবার কি এক দুর্ঘট! এখন এমন অবস্থা—দয়া-মাসী অবশ্য নিজের কান, শুচিবাই আর জপের মালা নিয়ে তেমনি সুদূর—তবু মনে হয়, দয়া-মাসীর যদি হঠাৎ পেছু-টান পড়ে, চলে যান, তো যে শূন্যতাটা এসে পড়বে সেটা পূরণ করব কি করে?

আশঙ্কাটা লুকানো রইল না, একদিন মুখ দিয়ে বেরিয়েও পড়ল। বললাম—"হ্যাগা কদম, তুই তো বাছা দিব্যি একটা অভ্যেসের মতন দাঁড় করিয়ে তুললি… তা বৈকি, মাসীমা রয়েছেন ওঁদের সেই গিরির ছেলে সেই টানেই তো—কিন্তু যখন আবার হঠাৎ বাড়ির দিকে টান পড়বে, ধরে রাখতে তো পারা যাবে না। বেশ একটা ফ্যাসাদ বাধিয়েছিস বাপু; বলেন যাওয়ার কথা কিছু?"

একটু হেসে যতটা সম্ভব নির্লিপ্ততার ভাব বজায় রেখেই বললাম। বেচ্চো অতিরিক্ত ধূর্ত, রেখেছে অবশ্য ভালোই, তবে কি ভেবে কি চাল যে দিচ্ছে ভেবে পাওয়া যায় না তো।

কদম ক্ষণিকের জন্য চোখটা একটু তুলে নিয়ে অল্প একটু হাসল, বলল— "অবিশ্যি যানই তো আর কি করা যাবে, স্ব-ইচ্ছেয় এসেছিলেন, স্ব-ইচ্ছেয় যাবেন, তবে···দেখুনই না, তোলেন কথা, তখন দেখা যাবে।"

হঠাৎ কি একটা কাজ মনে পড়ায় তাড়াতাড়ি চলে গেল ভেতর-বাড়িতে।

তারপর আরও বার কয়েক বলিয়ে নিল কথাটা, অবশ্য আমায় কোন প্রশ্ন না করেই। অর্থাৎ কিছু উচ্যবাচ্য করে না দেখে আমিই আবার মনের উদ্বেগ চাপা দিয়ে প্রসঙ্গটা তুললাম—

"হ্যাগা, বুড়োমানুষ, মনে করেন তো না হয় গঙ্গাস্নান করে আসতে পারেন, ত্রিবেণীটা কাছে; না হয় একদিন তারকেশ্বরই হয়ে এলেন, ব্যবস্থা করে দিই। ···বলেন না কিছু?"

অর্থাৎ বুড়োমানুষকে লোভ দেখিয়ে ধরে রাখতে চাই।

এবারেও কদম ক্ষণমাত্রের জন্য একটু চোখ তুলে হাসল, বলল—"যতদিন আছেন ততদিনই আছেন বাবাঠাকুর; খেয়ালী মানুষ, যাবার ঝোঁক ধরলে কি ওসবের কথা বলে ঠেকানো যাবে?"

আরও বার দু-এক তুললাম কথাটা, অবশ্য অন্যভাবে; কদমের ঐ এক উত্তর। তারপর একদিন ও নিজে হতেই প্রসঙ্গটা এনে ফেলল।

সময়টুকু যে বেশ ভেবে-চিন্তে বেছে নিয়েছিল কদম সে-সন্দেহটা অবশ্য অনেক পরে আমার মনে উদয় হয়।···হ্যাঁ, একটা কথা বলা হয় নি: আমার লেখাপড়ার মধ্যে আমি যে সব সময় অফিসের কাগজপত্র নিয়েই থাকি না, অন্যরকম কাজও থাকে এ-তথ্যটা কদম আবিষ্কার করে ফেলেছে। ওর ভাষায়, আমি পুঁথিও লিখি, ছড়াও বানাই। এর নয়গুলাও ও চেনে, ঘুরতে-ফিরতেই আড়চোখে একবার দেখে নিয়ে বাড়ির আবহাওয়াটা যথাসাধ্য অনুকূল করে তোলে, কোথায় কে জোরে একটু কথা বলেছে, রামকানাইয়ের বাসন মাজার শব্দ হচ্ছে, কি বাগানের দিকেই কিছু, ওর ইঙ্গিতে সব স্তব্ধ হয়ে যায়; চলা-ফেরাও চলে পা

টিপে টিপে, যাতে আমার নিস্তরঙ্গ ভাব-সমাধিতে এতটুকুও বীচিভঙ্গ না উঠতে পায়।

আরও আবিষ্কার করেছে এইসময় আমার মনটা থাকে নরম, সমবেদনশীল; যে আদেশটা বের করে নিতে গেলে, যে কাজটা করিয়ে নিতে গেলে অন্য সময় আমি হয়তো আপত্তি করব, তর্ক তুলব, খুব সূক্ষ্ম উপায়ে কদম সেগুলা এইসময় হাসিল করে নেয়। ওর নিজের পদ্ধতি আছে, তা আমার মনের গতির সঙ্গে এমনই সুরে-ছন্দে মিলানো যে একটু যে ব্যাঘাত হয় তা বোঝবার যেন অবকাশই দেয় না।

নূতন আষাঢ় পড়েছে। সেদিন বিকাল হবার আগেই আকাশ ঘেরে মেঘ জমে উঠতে লাগল, আমি কেরানিদের ডেকে অফিসের কাগজ-পত্রে তাড়াতাড়ি সই করে বাসায় চলে এলাম।

বারান্দা বেয়ে উঠে ঘরে পা দিয়েই মনটা যেন জুড়িয়ে গেল। এই জন্যেই না মেয়েটাকে এত ভালবাসি। যখন যে ভাবে থাকব, যেটি চাইব, কী সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে যে টের পায়! দেখি পুব দিকের জানালার সামনে, জানলা ঘেঁষে আমার লেখবার নীচু টেবিল আর আরাম চেয়ারটি ঝেড়ে-মুছে পাতা, ফুলদানিতে একটি টাটকা ফুলের স্তবক, কালো পাথরের রেকাবিটাতে আলগা করে রাখা জলে-ভেজানো বেল ফুল। টেবিলের একধারে ফাউনটেন পেনের স্ট্যাণ্ডটা।

আর বাড়ি সেইরকম স্তব্ধ। আরব্য রজনীর পাতা থেকে কোনও পরী উঠে এসে সব ব্যবস্থা ঠিকঠাক করে দিয়ে, এই বাড়ির কোথাও তটস্থ হয়ে প্রচ্ছন্নভাবে আছে দাঁড়িয়ে।

অফিসের কাপড়-চোপড় ছেড়ে, হাত-পা ধুয়ে কিছু জলযোগ করে—এক কথায়, বিরস গন্ধের জগৎ থেকে মনটা গুটিয়ে নিয়ে—খাতা-কলম নিয়ে লিখতে বসলাম।

বর্ষা নেমেছে এদিকে।

অল্প পরেই কদম কলকেতে ফুঁ দিতে দিতে এসে উপস্থিত হল, তারপর সেটা গড়গড়ার মাথায় বসিয়ে রবারের নটকার পাক খুলে নটকার মুখটা চেয়ারের হাতলে আস্তে আস্তে রেখে দিল। এইসব সময়ে রামকানাইয়ের বখল দেওয়া

কারণ, কদমের নিশ্চয় আশঙ্কা, হয়তো সামান্য কিছু একটা ভুল করে বসে আমার পুঁথি লেখায়, কি ছড়া বানানোয় ছন্দপতন ঘটাবে।

সটকাটা রেখে দিয়ে পা টিপে টিপে চলে যাচ্ছিল, আমার দৃষ্টিটা খাতা থেকে আপনা হতেই উঠে ওর ওপর গিয়ে পড়ল। মুখ থেকেও যেন আপনাআপনিই বেরিয়ে পড়ল—"যাচ্ছিস ?"

কদম দাঁড়িয়ে পড়ল।

আজ বড় ভালো লাগছে মেয়েটাকে। ওর এই প্রীতি, ওর এই সেবা, সর্বোপরি ওর এই রুচির উৎকর্ষ যার জন্যে এই লগ্নটিকে ও এমন মনের মতন করে আমার কাছে ধরে দিতে পেরেছে—সব মিলিয়ে ওর প্রতি স্নেহ-মমতায় কৃতজ্ঞতায় আমার মনটা যেন ছলছল করে উঠেছে হঠাৎ। এর ওপর ওর জীবনের যা ট্রাজেডি—এত নিম্নস্তরের হয়েও এত সুন্দর, সুষমান্বিত। আর এত সুন্দর হয়েও এত বেদনাতুর! কদম বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা—রামকানাই সে যেন নাম থেকে নিয়ে সব দিক দিয়েই ওর পাশে বিসদৃশ। গোটা Beauty and the Beast কাহিনীটা যেন, অথচ Beast-এর হাতে পড়েছে বলেই Beauty যেন আরও উজ্জল, সমস্ত ব্যাপারটা একটা ট্রাজেডি বলেই আরও মধুর।

কেন যে হঠাৎ ডাকলাম বুঝতে পারছি না। বর্ষার পটভূমিকায় আজ ওকে এমনি নূতন দেখাচ্ছে, ওর জীবনের ট্রাজেডিটা এমনই ঘনীভূত হয়ে উঠেছে যে ওকে যেন কিছু বলা দরকার—আর কিছু নয়তো ওর অভিভাবক যারা ওর জীবনটা এরকম হতে দিল, ওর সেই দাদু যিনি ওকে এইভাবে গড়তে গিয়ে ওর জীবনটা আরও ব্যর্থ করে দিলেন—এদের পক্ষ থেকে একটা সান্ত্বনার কথা না বললে কোথায় যেন একটা মস্ত বড় অন্যায় থেকে যাচ্ছে আজ।

কিন্তু মনে এলেও এসব কথা তো মুখে বলা যায় না। "যাচ্ছিস ?" বলে প্রশ্ন করতে কদম দাঁড়িয়ে পড়ল। মনের ক্ষণিক আলোড়নে কথাটা বেরিয়ে গেছে, ভুলটা বুঝতে পেরে বললাম—"কাজ থাকে তো যা।"

কদম সেইরকম অল্প একটু চোখ তুলে কি যেন একটা ভেবে নিল, তারপর বলল—"ঠাকরুন-মাকে জপে বসিয়ে আসছি বাবাঠাকুর। অকাল সন্ধ্যে, অত হিসেব থাকবে না তো ওঁর।"

একটু পরে পা টিপে টিপে এসে পাশে দাঁড়াল। বললাম—"বোস।"

ওটা আমার বলার সাধারণ ভাষা, সামনে বসে না কখনও কদম, জানলার একটা পাল্লায় ঠেস দিয়ে দাঁড়াল। ও আমার চেয়ে আমার মনকে বেশ বোঝে, জানে বলবার কিছু কথা নেই। আমার কলমেও কিছু কথা নেই, কাগজে ঠেকিয়ে বসে আছি—একটু চুপ করে রইল, তারপর কথাটা পাড়ল।

হ্যাঁ, তাই, একটা কথা পাড়বার জন্যেই কিছু দিন থেকে যেন লুকাচুরি করছিল কদম আর আজ সুযোগ বুঝে এত যত্ন করে আসরটা রচনা করেছিল। ওর দৃষ্টি সুদূরপ্রসারী; পরে বুঝেছি, কিন্তু তখন ধরতে পারি নি, ধরা পড়ে গিয়েছিলাম।

একটু নড়ে চড়ে দাঁড়িয়ে কথাটা পাড়ল কদম। বলল—"একটা কথা কদিন থেকে বলব বলব করছি বাবাঠাকুর, তা কাজের যা চাপ, দেখছি তো। তা যদি শোনেন, ফুরসত থাকে তো বলি।"

খাতা থেকে কলম তুলে নিলাম, বললাম—"তেমন দরকারী কথা তো বলিস নি কেন? কাজ—সে তো আছেই, ওর মধ্যেই আবার সব করে যেতে হবে তো।"

"দরকারীই।...ঠাকরুনমাকে নিয়ে।"

"মাসীমাকে নিয়ে!...কী কথা এমন?"

—আমার দৃষ্টিতে একটু ঔৎসুক্য প্রকাশ হয়ে পড়ল। কদম দেখে নিয়ে বেশ একটু নির্লিপ্ত ভাবেই বলে গেল—

"আপনি বললেন বটে কবার, চান তো ত্রিবেণী কি তারকেশ্বরে হয়ে আসুন, —বললেন বটে জিগ্যেস করতে, কিন্তু আমার আদবে ইচ্ছে ছিল না। হঠাৎ ভিক্ষি করতে গিয়ে এক জায়গায় উঠেছি দুজনে, পরিচয় হল, ঠাকরুনমায়ের ছেলে শুনে আত্মিত দেখিয়ে আসতে চাইলেন, নিয়ে এলুম। বুড়ো মানুষ, একমুঠো করে খাবেন, পড়ে থাকবেন, তাতে বাবাঠাকুরের কুবেরের ভাঁড়ার খালি হয়ে যাবে না। তারপর যেমন এসেছেন যেদিন যাবার কথা মনে হবে লোক দিয়ে পাঠিয়ে দেওয়া যাবে। এই মোটা কথাটা জানি আমি, সুতরাং আর খোঁচাখুঁচি করে কথা বাড়াবার ইচ্ছে ছিল না আমার। তবে আপনি আবারই বলছেন-

হুকুমের চাকরই তো আমরা—সাত-পাঁচ ভেবে, মনটা একটু যেন কেমন-কেমন দেখে কাল তুললুম কথাটা।

তারপর, যা ভয় করেছিলুম—কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ....."

প্রশ্ন করলাম—"কি রকম ?"

"তা বৈ কি। আমি একটু গোড়া বেঁধেই কথাটা তুলেছিলাম বাবাঠাকুর, ভাবলুম এইটেই আগে ঠাহর করে নিই না—পেছটানের কিছু আছে কি-না সেখানে। জিগ্যেস করলুম—দুদিন থেকে যেন একটু অন্যমনস্ক দেখছি ঠাকরুন-মা, এখানে আর মন টেঁকছে না ?"

বললেন—"মন টেঁকবে না কেন বাছা—মন খুবই টেঁকচে। আমার এখন জপের মালা হাতে করে যে কোন জায়গায় কাটিয়ে দেওয়া। তা, রক্তের-সুবাদে কেউই নয়, তবু মায়ের চেয়ে বড় করেই তো রেখেছে গিন্নির-ছেলে ; মন টেঁকবে না কেন, ভালো করেই টেঁকছে।"

আমি পেটের কথাটা বের করবার জন্যে বললুম—"তবে আর কি, মন টেঁকছে তো থেকে যান-না, কাছেই গঙ্গা, বুড়ো বয়েসে তো চায় সবাই কাছাকাছি থাকতে, আর পেছটানও তো কিছু নেই।"

এই তখন গিয়ে আসল কথাটা বেরুল বাবাঠাকুর—অ্যাদ্দিন পেটকাপড়ে লুকিয়ে রেখেছিলেন, জানি কি ? বললেন—"পেছটান তো থাকবার কথা নয় বাছা, পোড়াঠাকুর সব তো ঘুচিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু সব ঘুচিয়েও একটা পেছটানে যে ঘাটের সঙ্গে নোঙর করে রেখেছেন, কোথাও দুদিন গিয়ে কি শান্তিতে থাকবার জো আছে ?"

তারপরেই একেবারে ধরে বসলেন—"তুই ব্যবস্থা করে দে একটু বাছা। গিন্নির ছেলেটা ভালো, কোন ঝঞ্ঝাটও নেই, এটুকু ভার যদি তুলে নেয় তো আর সেই বনের মধ্যে ফিরে যাই না, কাছে গঙ্গাও, কটা দিনই বা আর আছি ?"

আমি বললুম—"সে কি করে হবে। ছেলেমানুষ হলেও একটা কথা ছিল, একটা সোমত্ত মেয়ে, তার দায় ঘাড়ে করা···"

কদম অপাঙ্গে আমার মুখের দিকে একবার চেয়ে নিল, আমি চকিত হয়েই প্রশ্ন করলাম—"সোমত্ত মেয়ে !"

কদম নির্লিপ্তভাবে বলে যেতে লাগল—"নিজের তো কেউ নেই। ভাসুরের নাতির একটি মেয়ে, তিনকুলে কেউ নেই, সেইটিকে আগলে রয়েছেন তো। এসেছেন এক জ্ঞাতির বাড়ি রেখে, কিন্তু মন মানবে কেন ?···আমি মনে মনেই বললুম—দিব্যি ছিলে, তা সইবে কেন কপালে ?···হ্যাঁ, বাবাঠাকুর এখন গেলেন পরের বোঝা ঘাড়ে করতে; দায়ে পড়ে গেছে !···প্রথমেই তো খুঁজে পেতে তাকে পাত্রস্থ করবার ভাবনা···নির্ঝঞ্ঝাট মানুষ বাবাঠাকুর।"

চুপ করল কদম। শুধু তার সন্ধানী দৃষ্টিটা মাঝে মাঝে এসে পড়তে লাগল আমার মুখের ওপর।

বেশ একটু ধাঁধায় পড়ে গেছি বৈকি। সমস্ত ব্যাপারটায় কোথায় যেন একটা অসঙ্গতি রয়েছে, যেমন অসঙ্গতি রয়ে গেছে দয়া-মাসীমার আসায়। ওকে যেন আজকাল কিছু বুঝিও; ওর বলার ভঙ্গিতে, ওর মাঝে মাঝে চোখ তুলে চেয়ে নেওয়ার ভঙ্গিতে যেন টের পাচ্ছি ও যতটা অজ্ঞ আর নিরীহ সাজছে আসলে ততটা নয়, হয়তো দয়া-মাসীমাকে এনে ফেলার পর ওর এটা দ্বিতীয় চাল,—নিজের দল পুরু করা। বুঝছি, তবুও মনস্থির করে উঠতে পারছি না।

ওর থেকে আলাদা হয়ে একটু চিন্তা করবার জন্য বললাম—"কলকেটা আর একবার পালটে দিবি ? বর্ষায় যেন মিয়ে যাচ্ছে। নেমেছেও তোড়ে বর্ষাটা।"

কদমের মনে আমি মাত্র একটু উঁকিঝুঁকি মারতে পারি; কিন্তু আগেই বলেছি ও আমার মনটাকে খোলা বইয়ের মতো পড়ে নিতে পারে। বেশ সময় দিল আমাকে। ও যেন নিশ্চিন্ত, যেমন ব্যবস্থা করে তুলেছে কথাটা; আমার আর উপায় নেই রাজি না হয়ে।

ঠিকই ধরেছে ও।

জানি না কেন বা কিভাবে ও দয়া-মাসীকে এনে তুলেছে, কিন্তু এখন ওঁকে আমার চাই। কোন দিন হয়তো দিনান্তেও একবার দেখা পাই না, তবু আমার সংসারে যে দয়া-মাসী আছেন, দরকার হলে 'গিন্নি' বলে মায়ের উল্লেখ করবেন, মায়ের দোষ ছেলেয় বর্তেছে বলে আমার থালার সামনে বসে অনুযোগ করবেন, এটা আমার না হলে চলবে না। আমার জীবনে বর্তমানটাই বড়। এ-ধরনের জীবনেও ভবিষ্যৎ একটা অবশ্য আছেই, কিন্তু তার কোন মূল্য নেই আমার কাছে।

আর ওঁকে ধরে রাখবার জন্যে যদি প্রয়োজন হয় তো ওঁর আশ্রিতা মেয়েটিও আসুক। তারপর দায়িত্বের কথা, একটা অনূঢ়া মেয়ে। কিন্তু অনূঢ়া বলেই সে কদিনেরই বা অতিথি? একটা ব্যবস্থা হলেই নিজের ঘরে গিয়ে উঠবে।

বাড়ি থেকে যে কেউ আসে না। দরদীরা অনুযোগ করে। লজ্জায় ফেলে, এর জন্য কি অভিমানও ছিল আমার এই সিদ্ধান্তের মধ্যে? থাকলে আশ্চর্য হব না।

কদম কলিকাতে ফুঁ দিতে দিতে পা টিপে টিপে এল; অনুভব করছি ওরই মধ্যে চোখ তুলে তুলে দেখতে দেখতে আসছে আমায়। হারলাম ওর চালের কাছে—এক হিসাবে হারই বৈকি, কিন্তু একটু ঘুরিয়ে মেনে নিলাম সেটা, পরাজয়েও সান্ত্বনার একটা কিছু তো রাখেই ধরে মানুষ। সটকাটা তুলে নিয়ে প্রশ্ন করলাম—"তাহলে তোর ইচ্ছেটা নয় এ নতুন ঝক্কি আবার ঘাড়ে এসে পড়ে?"

স্পষ্টভাবে মুখের ওপর চোখ রেখে করলাম প্রশ্নটা। বেশ স্পষ্ট দেখলাম কদম একটু ধাঁধা খেয়ে গেল, উত্তরটা দিতে গলায় একটু আটকে গেল—

"হ্যাঁ···আমি···বলছিলুম···তা ঝক্কি বৈকি—একটা মানুষের খরচ···"

বললাম—"হ্যাঁ, আর বুড়ো মানুষ নয়তো যে শুধু একমুঠো খাওয়া। শাড়ি আছে, শায়া আছে, ব্লাউজ আছে—তার ওপুর আজকালকার মেয়ে· পাত্র খোঁজাখুঁজির হাঙ্গাম তো রয়েছেই তার ওপর।"

"হ্যাঁ, তা বৈকি···"

শুষ্ক কণ্ঠে উত্তর করল কদম। আমি বিলম্বিত লয়ে খানিকটা গড়গড়া টেনে যেতে লাগলাম। তারপর এক সময় সটকাটা মুখ থেকে সরিয়ে নিয়ে বললাম—"কিন্তু ভেবে দেখেছি দয়া-মাসীমা বড়-মুখ করে বললেন, একেবারে 'না' বলাটা ···আর এমন তো পাট্টা লিখে দিচ্ছি না যে চিরকাল পুষে যাব।···কি বলিস?"

একটা উৎকণ্ঠ দীর্ঘশ্বাস চাপা ছিল কদমের বুকে, আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল। বলল—"তা বৈকি।"

বললাম—"অবিশ্যি ঝক্কি ঘাড়ে নিতে তুই। কি রকম মেয়ে আবার তা তো জানি না, তুই নিশ্চয় শুনিস নি কিছু।"

এবার হাসিও ফুটল কদমের মুখে, বলল—"সে আপনি নিশ্চিন্দি থাকুন, যেরকমই হোন না তিনি। কেন, আপনার ঠাকুর-চাকর-মালীকে দেখেছেন না? চেনা যায় আর? ভদ্র ঘরের মেয়ে, ওদের চেয়ে তো ব্যাঁকা হবে না।"

ভেতরের দিকে পা বাড়িয়ে আবার ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল—"নামটি হল সুপর্ণা।...একেবারে নতুন ধরনের নাম নয়?...মানেটা কি হল বাবাঠাকুর?"

বুঝলাম একটু অপ্রাসঙ্গিক হলেও ফুর্তির চোটেই কথাটা না বলে পারল না কদম।

বললাম—"আজকাল অবিশ্যি ঐরকম হচ্ছে, তবু পাড়াগেঁয়ে মেয়ের পক্ষে নতুন বৈকি।...মানে ভালো পাতা যার। মেয়েদের আবার লতার সঙ্গে তুলনা দেয় তো..."

কদম একটু হেসে উঠল, একটু বাধা দিয়েই বলল—"বাবাঠাকুরের নাতনী হলেন তো, নামের ব্যাখ্যানা করে আশ মিটছে না।"

আমি ও দিকটা ভাবি নি, ভ্রূ কুঁচকে হিসেবটা করে নিয়ে একটু হেসেই বললাম—"নাতনীই হল, না? তা বেশ ভালোই হল, কি বলিস?"

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেল, একটু উল্লসিত হয়েই বললাম—"ওরে সত্যিই ভালো হল, তুই ভাইঝির বিয়ে দিয়ে ঘরজামাই বলছিলি না?—ও যে দেখছি একেবারে নাতনী—নাতজামাইয়ের জোগাড়; কপাল খুলে গেল আমার!"

কদমও একটু চোখ তুলে একটা যেন কি হিসাব করে নিয়ে হেসে বলল—"বেশ তো, আমার একটি বক্‌শিশ পাওনা হল তাহলে।"

তারপর মুখটা গম্ভীর করে বলল—"ভালো হলেই ভালো। আমি তো ভেবে মরছিলুম ঠাকরুন-মা আবার একি এক উপদ্রব এনে ফেললেন!"

চলে গেল একটু প্রসন্ন হাসি মুখে করে। খুব একটা জিত হয়েছে নিশ্চয়, নৈলে ঠাট্টাটা মুখ দিয়ে বেরুত না।

যত চিন্তা করে দেখি আমার সন্দেহ থাকে না যে কদম এই চালই চেলেছে। আমার কোন ভাইপোর যোগ্য হলেই পুরোপুরি ওর মনের মতো হত, কিন্তু একেবারে মনের মতো তো হয় না। নাতনী এনে ফেলেছে; একটা ভয় ছিল, সেটা গেছে কেটে, এবার নাতজামাই এসে পড়বেই একদিন, আমায় চেনে তো।

আমিও গোড়া বেঁধেই আরম্ভ করলাম। তাইতে রূদমকে আর একটি মানুষের আবির্ভাব হল, আমার অফিসের স্টেনোগ্রাফার রজত।

রজত ছেলেটি বড় ভালো। প্রিয়দর্শন, বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশ, কাজেকর্মে চৌকশ হয়েও এদিকে বেশ বিনয়ী। এমন একটি ছেলে যার একটু সুরাহা করে দিতে ঊর্ধ্বতন অফিসারের মনে আপনা থেকেই একটা আগ্রহ জাগে। চিন্তাও করছি একটু একটু সেদিকে।

ঠিক করলাম রজত গিয়ে সুপর্ণাকে নিয়ে আসবে, অবশ্য একা নয়, সঙ্গে যাবে রামকানাই।

গোড়াতেই একটু গোল বাধল।

একটু বিস্মিত হয়েই অনুভব করলাম, ব্যবস্থাটা রূদমের পছন্দ হল না। স্পষ্ট কিছু বলল না, তবে ভাবটা দেখাল যেন অপর কোন ব্যবস্থা যদি করতে পারি তো ভালো হয়।

সত্য কথা বলতে কি মনে মনে একটু বিরক্তই হলাম, তবে সে-ভাবটা চেপে একটু ঠাট্টা করেই বললাম—"অবিশ্যি নাতনীই যখন, নিজেই কাঁধে করে নিয়ে এলে ভালো হত, কিন্তু দেখলি এই তো সেদিন পাঁচদিনের ছুটি নিয়ে বাড়ি ঘুরে এলুম। তাহলে এখন ছেড়ে দিতে হয়।"

আর কথা বাড়াল না রূদম, হেসেই বলল—"আমি বলছিলুম—ওঁরা যদি অন্যের সঙ্গে পাঠাতে গুঁই-গাঁই করেন—পাড়াগাঁয়ের লোক তো।"

বললাম—"কেন, একা রজত নয় তো, সঙ্গে রামকানাই রয়েছে।"

হেসেই বলল—"সে আপনি রজতবাবুর সঙ্গে একটা কাঠের গুঁড়িও দিয়ে দিতে পারেন, একই কথা।"

রামকানাইকে সঙ্গে করে রজত একদিন গিয়ে সুপর্ণাকে নিয়ে এল।

সমস্ত ব্যাপারটাতে আমার একটা আন্দাজ পাকা হয়ে গেল। রূদম নিতান্ত হঠাৎ পরিচয়ে দয়া-মাসীকে তারকেশ্বর থেকে নিয়ে আসে নি, বাড়ি পর্যন্ত গিয়েছিল এবং বেশ একটি পাকা কথাবার্তা করে নিয়ে এসেছে, এবং তার মধ্যে পরে সুপর্ণাকেও আনিয়ে নেওয়ার প্রতিশ্রুতি ছিল। এমন কি এও হতে পারে, হয়তো তারকেশ্বরের কাহিনীটাই কাল্পনিক। ঠিক এই ধরনের কিছু ভেতরে না থাকলে

একজন সমর্থ মেয়েকে শুধু একটা চিঠির ওপর কে বাড়ির বাইরে পা দিতে দেবে?

এইগুলা স্পষ্ট হার আমার কাছে চতুর কদমের। এক ধরনের একটা আনন্দ পাই। কিন্তু বলা যায় না তো! তাসের ঘরটা সাজিয়েছে মন্দ নয়, গৃহ-হীনের লাগছে ভালো, একটু টোকা মারতে গেলেই যে ঝুরঝুর করে ভূমিসাৎ হয়ে যাবে।

চলুক না। ওর প্ল্যানটা শেষ পর্যন্ত কী বসে বসে দেখাই যাক একটু।

এদিকে আমার প্ল্যান যে বানচাল হতে চলল, তার কি করা যায়?

আমার অধস্তন কর্মচারী, তাকে স্নেহ করি, যতটা একতিয়ারে আছে চারিদিকে দিয়েই তার ভালো করতে চাই; স্নেহ চায় নিবিড়তা, তাই যতটা সম্ভব তাকে নিজের কাছে এনে ফেলতে চাই। তার পথেও তুলে দিয়েছি। কিন্তু এর বেশি আর কি করব? হাঁটি-হাঁটি পা-পা করে তো আর হাত ধরে এগিয়ে নিয়ে আসতে পারি না।

গোপন করে লাভ নেই—আমাদের মতো যাদের লেখার বাই আছে এবং আমার মতো যারা নিঃসঙ্গ তাদের রোম্যান্সের দিকে ঝোঁকটা একটু বেশি থাকে। আমি যে গোড়া বেঁধে আরম্ভ করার কথা বললাম তার অর্থটা তাই। এদিকে মিষ্টি নাতনী-সম্বন্ধ, ওদিকে রজত, আমি একটা স্পষ্ট উদ্দেশ্য নিয়েই যোগাযোগটা স্থাপন করতে গেলাম। কিন্তু সব বুঝি যায় ভেস্তে। যতই না কেন চাই রোম্যান্স, অধীন একজন কর্মচারীকে হাতে ধরে তো রোম্যান্সে তালিম দিতে পারি না।

সুপর্ণা আর রজত গাড়ি থেকে নামল যেন এখন পর্যন্ত ওরা দুজনে পরস্পরের একেবারেই অপরিচিত, ও যদি হাওড়া-জেলার বেলে-প্রতাপপুর থেকে এসে থাকে তো এ এসেছে বর্ধমানের রায়না কি রূপগঞ্জ থেকে। নামলও আগে রামকানাই, তারপর একটু জড়িত-চরণক্ষেপে সুপর্ণা, যেমন কতকটা ভাবাই গিয়েছিল; রজত নামল সব শেষে। ঘোড়ার-গাড়ির একটা কোণে গুটিয়ে-সুটিয়ে বসে ছিল, চোরের মতো নেমে একটু পাশে গিয়ে দেখল জিনিসপত্রগুলা নামানো, কতকটা আড় চোখেই, যেন সরে পড়তে পারলেই বাঁচে। আমি, বেশি না হোক একটু কিছু আশা করেছিলাম বৈকি, তার কিছুই লক্ষণ না দেখে যেন হতবাকই হয়ে

গেছি, সেই তালে ও আস্তে আস্তে চোরের মতোই সরে পড়ল। আজকালকার ছেলে, প্রায় একটা দিন একবাড়িতে কাটিয়েছে, পুরো একটা বেলা একসঙ্গে এসেছে, ছোট্ট একটা বিদায়-নমস্কারও জানাতে পারল না।

সুপর্ণাকেও দেখলাম। পায়ে পায়ে জড়াজড়ি করে একেবারে নববধূটির মতো কোনরকমে গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়াল রজতের উল্টো দিকে মুখ করে। যতক্ষণ না স্থান ত্যাগ করে রেহাই দিল রজত, একভাবে দাঁড়িয়ে রইল, তারপর আড়চোখে একবার খালি জায়গাটা দেখে নিয়ে ওর যেন সম্বিত ফিরে এল, এগিয়ে এসে একবার আমার মুখের দিকে দেখে নিয়ে পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করল। আমার এত যত্নের রোম্যান্স যে ভূমিষ্ঠ হবার আগেই শেষ নিঃশ্বাস মোচন করেছে আর সন্দেহ মাত্র রইল না।

মেয়েটি কিন্তু ঠিক ও ধরনের নয়। ততক্ষণে কদম ভেতরে গিয়ে দয়া-মাসীমাকে ডেকে নিয়ে এসেছে, ওঁকে দেখার সঙ্গে সঙ্গেই ওর যেন আসলরূপটি খুলে গেল।

এগিয়ে প্রায় জড়িয়েই ধরতে যাচ্ছিল, সামলে নিয়ে অনুযোগের সুরে বলল—"বেশ মানুষ তো! এসে ফিরে যাওয়ার নাম তো নেই-ই, একটা খবরও যে……"

বেশ গলা তুলেই আরম্ভ করেছিল, কালামানুষের কাছে যেমন দরকার, হঠাৎ থেমে গিয়ে প্রণামটা সেরে নিয়ে কদমের দিকে চেয়ে বেশ পরিচিতের মতোই আরম্ভ করল—"তা তুমিও তো কৈ……"কদম চোখের কোণটা একটু টিপে দিতে একটু অপ্রতিভ হয়ে চুপ করে গেল। আমি অবশ্য দেখেও দেখলাম না, কিন্তু কদম কদমই তো, ওটুকুও বেশ ভালো করে সামলে নিল, চোখের কোণটা আর-একবার টিপে আমার দিকে মাথাটা ঝুঁকিয়ে বলল—"ওঁকেও প্রণাম করো, নতুন দাদু।"

এইটুকুতেই আবার বেশ সপ্রতিভ হয়ে গেছে, সুপর্ণা একটু হেসেই বলল—"তা দেখেই বুঝেছি, নেওয়াও হয়ে গেছে পায়ের ধুলো।"

কথাটা উঠল বলে বারণ করবার আগেই আর-একবার এসে প্রণাম করল। আমি বললাম—"তবেই হয়েছে? এত লোভ হলে আমার ধুলোর-ভাঁড়ার যে খালি হয়ে যাবে।"

একটু হাসল, তারপর কদমের দিকে চেয়ে বলল—"অথচ দুবার চেঁচেও যে এতটুকু হাতে উঠল না, সেটা ধরবেন না দাদু।"

এইরকম মেয়ে, পাড়াগাঁয়ের মুক্তিও আছে অবগুণ্ঠনও আছে। একটার বাড়াবাড়ি হলেই অন্যটা এগিয়ে আসে, দুইয়ে মিলে বেশ মিষ্ট, শহুরে চোখে একটু অভিনব ঠ্যাকেই আমাদের।

পাড়াগেঁয়ে মেয়ে হিসাবে বয়স একটু বেশি হয়েছে, বছর কুড়ি তো হবেই, এক-আধ বছর বেশিই হবে। সৌন্দর্যটা অবহেলিত, পাতায় ঢাকা ফুলের মতো একটু আভা ছড়িয়ে আছে।

ওরা সবাই ভেতরে চলে গেল। আমি রামকানাইকে আগে গড়গড়াটা তোয়ের করে আনতে বলে আরাম কেদারায় গা-এলিয়ে দিয়ে নূতন সমস্যার মুখো-মুখি হয়ে বসলাম।

সুপর্ণা আসাতে আমার দৈনন্দিন জীবনে একটা পরিবর্তন দেখা দিল। আমার ব্যক্তিগত প্রয়োজনের যে-সব কাজ কদমের হাতে ছিল আস্তে আস্তে ওর হাতে এক এক করে চলে এল। এইটেই স্বাভাবিক, তবু প্রথমটা এই ভেবে একটু কষ্ট হয়েছিল যে কদম বুঝি বেদখল হয়ে পড়েছে; বাবাঠাকুরের সেবা করাই তো সব চেয়ে বড় কাজ ছিল ওর, আর কী গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে যে কাজগুলা করত তাও তো দেখেছি। একটু কষ্ট হয়েছিল, অথচ কদমের পক্ষ নিয়ে কিছু বলতে পারছি না যাতে তার অধিকারটা খানিকটাও বজায় থাকে, এমন সময় একদিন একটা ব্যাপারে এ ধারণাটা একেবারে বদলে গেল।

সেদিন শরীরটা বেশ জুতসই না থাকায় খানিক আগেই আমি অফিস থেকে চলে এলাম। বারান্দায় উঠেছি এমন সময় দেখি কদম বেশ একটু ব্যস্ত হয়েই ঘর থেকে ভেতরের দিকে চলে যাচ্ছে। চৌকাঠ পেরুতে পেরুতেই আওয়াজও উঠল—"হ্যাগা দিদিমণি, তোমায় কতবার বলতে হবে এক কথা?"

সুপর্ণা ওদিককার কোন ঘর থেকে বেরিয়ে এগিয়ে আসতে আসতে প্রশ্ন করল—"কথাটা কি? তাহলে বুঝি কতবার বলেছিল।"

"একটা নয়, কোনও জিনিসই তোমার তালে থাকছে না, আবার বুঝি সেই

চাকর-মালীর সময় ফিরে এল বাবাঠাকুরের ঘরে।···এটা যে পড়তে পড়তে টেবিলের মাঝখানে ফেলে এসেছ? পছন্দ করেন হেলাফেলা করে জিনিস ছড়িয়ে রাখা? তাহলে বাপু আমায় আবার নিজের হাতেই তুলে নিতে হয় সব।"

একটা নূতন আবিষ্ক্রিয়ার সম্ভাবনায় বাইরেই দাঁড়িয়ে আছি আমি, স্বপর্ণা এগিয়ে এসেছে আরও, বলল—"ওমা, ওখানেই ফেলে এসেছি, দে।"

"আর ইদিকেও দেখবে এসো; বলছ তো।"

—দুজনে ঘরে আসতে আমি বারান্দায় একটু জানলার আড়াল হয়ে দাঁড়ালাম। কদম ঘরের মাঝে দাঁড়িয়ে বলল—"আর দেখো, কি কাণ্ড।"

স্বপর্ণা দেখে নিয়ে বলল—"কেন, ঠিক তো রয়েছে।"

"আমার মাথা রয়েছে। মালীটাও যেমন উজবুক, তার ওপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্দি হয়ে থাকলে চলে? তোমায় বললুম না যে-সময়ের যে ফুল। বাগানে দেখলুম নিশিগন্ধা ফুটতে আরম্ভ হয়েছে, এখন সগ্‌গ থেকেও অন্য ফুল এনে রাখলে চলবে?—বাবাঠাকুরের যে তিনটে ফুলদানিতে গোলাপ বোঝাই করে রেখেছে?······আর তোমার অমন নাটক-নবেল পড়া ছাড় বাপু, বদ অব্যেস—সেখানে গিয়েও দেখেছি তো।"

আমার যেন কল্পনাতেই মনে হল ভুলের গুরুত্বটা দেখে স্বপর্ণা বিদ্রুপ দৃষ্টি নিয়ে গোলাপের তোড়ার দিকে চেয়েছিল, হেসে বলল—"বরং তোর বাবাঠাকুরের বদ অব্যেসটাই ছাড়াব আমি, গোলাপ ছেড়ে নিশিগন্ধা। অরুচি!"

আমি বারান্দায়—বার দুই জুতো ঠুকে এগিয়ে গেলাম, বললাম—"কি যেন অব্যেস ছাড়াবার মতলব আঁটছেন স্বপর্ণাদেবী? প্রায় তপোভঙ্গের মতন শোনায় যে—অব্যেসটাকে আবার একটা যোগ বলেন তো গীতা।"

এইরকম দু-একটা আরও ছোটখাট অভিজ্ঞতা হল যাতে নিশ্চিন্ত হলাম স্বপর্ণা আসার পর এইটেই শোভন বলে কদম আপনা হতেই সরে দাঁড়াচ্ছে। বলা বাহুল্য রামকানাইকে সরিয়ে কদম নিজে এসে দাঁড়াতে যেমন ভালো লেগেছিল—ঠিক অতটা না হলেও, এই নূতন পরিবর্তনটা অপেক্ষাকৃত আরও ভালোই বোধ হল। তার একটা বড় হেতু, স্বপর্ণার সঙ্গে আমার সম্বন্ধটা—পাতানোই হোক, বা যাই হোক। মেয়েটি বুদ্ধিমতী, মনটিও বেশ সরল, কাজকর্ম

নিয়ে আমার চারিদিকে যখন ঘোরাঘুরি করে, সুযোগমতো যে উত্তর-প্রত্যুত্তর চলে তাতে সমস্ত সময়টুকু বেশ উপভোগ্যই হয়ে ওঠে। আমার ঠিক মনের যা গঠন সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে, ঠিক এই ধরনের ব্যবস্থাই যেন পাওনা ছিল আমার, ওদিকে বঞ্চিত হয়ে এসেছি, এখন সুপর্ণা এসে অভাবটা মিটোচ্ছে একটু একটু করে।

এদিক দিয়ে দেখতে গেলে সে আমার জীবনের একটা মস্তবড় শূন্যতা ভরাট করে দিচ্ছে। সময়টাও হয়েছে অনুকূল, কেননা এখন যা বয়স তাতে 'অন্তকারুর' চেয়ে নাতনীই তো বেশি শোভনীয়।

কিন্তু যেমন ভরেছে তেমনি আবার শূন্যতার সৃষ্টিও তো করেছে। বেশ অনুভব করছি সুপর্ণাকে পরিপূর্ণ করে পাওয়া যেতে পারে এক রজতের মধ্যে দিয়ে। সেখানে সেই এক ভাব—সেই যে এ গাড়ি থেকে নেমে এদিকে মুখ করে দাঁড়াল, ও দাঁড়াল একেবারে উল্টো দিকে মুখ করে।

চেষ্টা করছি, হাল ছেড়ে বসে নেই, কিন্তু কিছু ফল হচ্ছে না।

রজত আমার স্টেনোগ্রাফার। সে-হিসাবে বাড়িতে এসে কাজ করতে হয় মাঝে মাঝে। আগে, ছুটি-ছাটার দিন, কিংবা যদি কিছু অসুস্থ হয়ে ছুটি নিয়েই বসলাম তো ও এসে খোঁজ নিয়ে যেত কোন কাজ আছে কিনা। সুপর্ণা আসার কয়েকদিন পরেই উপরোউপরি তিন-দিনের ছুটি গেল একটা। প্রথম দিন তো ঘুরেও দেখল না রজত। বাড়িতে কাজ আমি সাধারণ কমই করি, যে অবসরটুকু হাতে এল, নিজের লেখা নিয়ে কাটাই। এবারে কিন্তু দ্বিতীয় দিন বিকাল পর্যন্ত ওর পথ চেয়ে শেষে ডেকে পাঠালাম। ডেকে পাঠালাম ঠিক যখন সুপর্ণা ভেতর থেকে এসে আমার অফিস-ঘর গোছানো নিয়ে থাকবে।

একটু বিরক্তও হয়েছি বৈকি, বাড়াবাড়ি নয়? ইচ্ছা ছিল, ভেতরেই বসে থাকব, দেখি কে কতক্ষণ মুখ ফিরিয়ে থাকতে পারে, কিন্তু অতটা আর করলাম না। সামনে আর একখানা চেয়ার পাতিয়ে নিয়ে বারান্দাতেই বসে রইলাম। রজত যখন এল তখন সুপর্ণা পুরো দমে আমার ঘর গুছোচ্ছে, রুচি নিয়েই ঠাট্টার মধ্যে দিয়ে আমাদের কি একটা মতভেদ চলছিল, সুপর্ণা একটা অতিরিক্ত রংচঙে পেপারওয়েট তুলে নিয়ে নিজের মতের স্বপক্ষে বেশ উৎসাহিতভাবে কি একটা

বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় রজত এসে নমস্কার করে দাঁড়াল, প্রশ্ন করল—"ডেকে পাঠিয়েছিলেন স্যার ?"

আমার দুটো চোখ দুদিকে রয়েছে ; দেখি সুপর্ণা যেন হঠাৎ পাষাণ-মূর্তিতে পরিণত হয়ে গেছে। পেপারওয়েটসুদ্ধ হাতটা ঠিক তেমনিভাবেই তুলে ধরে রয়েছে, মুখটা এদিকে ফেরানো, আর দৃষ্টিতে—শুধু আতঙ্ক হলে বুঝতে পারতাম—কত কী যে রয়েছে হিসাব করে ওঠা যায় না। সময়ও ছিল না অত হিসাব করবার, রজত উত্তরের জন্য দাঁড়িয়ে, বললাম—"হ্যা, কাজ করব একটু। কাল আস নি, শরীর ঠিক আছে তো ?"

বার কয়েক দৃষ্টি ভেতরে ছুটে গেছে এর মধ্যে, বলল—"তা, হ্যা, ঠিকই—তবে একটু খারাপ ছিল, মানে আজকাল আবার......"

আমিই পূরণ করে দিলাম, বললাম—"সিজন চেঞ্জের সময় তো।...আজ কেমন আছ ? পারবে বসতে ?"

দৃষ্টিটা একবার ঘরের মধ্যে গিয়ে পড়েই ফিরে এল, রজত উত্তর করল—"কাজ যদি থাকে তো......"

বললাম—"খানিকটা সেরে রাখি, তিন দিনে আবার বেশি জমা হয়ে পড়বে তো। আর্জেন্ট ফাইলগুলো নিয়ে এস টেবিল থেকে।"

সুপর্ণার হাতটা অবশ্য নেমে গেছে, দৃষ্টিও আর এদিকে নয়, টেবিলে-নিবদ্ধ ; তবে পায়ের শক্তি এখনও ফিরে আসে নি, 'ন যযৌ ন তস্থৌ' হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। রজত আর-একবার দেখে নিয়ে নিরুপায় ভাবে ভেতরে চলে গেল এবং সুপর্ণার পাশ দিয়ে গিয়ে টেবিলের ওদিক থেকে গোটা চার ফাইল যা ওপরে পেল নিয়ে আমার চেয়ারের হাতলে রেখে দিল। আমি একটা বেছে নিয়ে বললাম—"যেগুলোয় এইরকম লাল আর্জেন্ট স্লিপ আঁটা আছে।"

যেন একটা আনাড়িকে বোঝাচ্ছি।

"ও !"—বলে আর-একবার গেল এবং এবার বেছে বেছেই গোটা তিনেক নিয়ে এল। তবে আসবার সময় গোটা তিনেক যে নীচে পড়ে গেল একটু বিশৃঙ্খল হয়ে সেগুলো আর ফিরে গিয়ে তুলে রাখল না। তাতে অবশ্য একটু ভালোই হল—দেখলাম সুপর্ণার শরীরে আর একটু সাড় ফিরে এসেছে,

একটা কাজ পেয়ে যেন বাঁচলও, নীচু হয়ে ফাইল কটা কুড়িয়ে আবার গুছিয়ে রেখে দিল।

কাজ অবশ্য এগুল না মোটেই। ঘরে-বাইরে মন রাখতে গিয়ে ডিকটেশান দিতে আমার মাঝে মাঝে গোলমাল হয়ে যেতে লাগল; তার চতুর্গুণ গোলমাল রজত করতে লাগল ডিকটেশান নিতে। ওদিকে গোছাতে গিয়ে টেবিলের র‍্যাকের ওপর রাখা কাচের ফুলদানি প্রায় নীচে আছড়ে পড়েছিল, সুপর্ণা সামলে নিলেও খানিকটা জল টেবিলে ছড়িয়ে পড়ল। আমি অবশ্য দেখতে পাইনি, তবে এবারেও একটা ভালো ফল এই হল যে সুপর্ণা আবার খানিকটা কাজ পেল, পেছন ফিরে আমাদের দিক থেকে টেবিলটা আড়াল করে নিয়ে মুছে-মাছে ঠিক করে দিতে লাগল।

তবুও আমি টেনেবুনে প্রায় তিন কোয়ার্টারের মতো চালিয়ে গেলাম। তারপর ছেড়ে দিলাম। রজতকে বললাম—"কাল আবার এসো, ঠিক এই সময়, অবশ্য শরীর যদি ভালো থাকে।"

শরীর বেশ ভালোই রইল রজতের, কাজও হল খানিকটা, একটু আধটু গোলমাল যা হতে লাগল, তা শুধু আমার তরফেই।

গোলমালের কারণ, দেখলাম সুপর্ণা অনুপস্থিত। তারপর এল, সুপর্ণা নয়, তার জায়গায় কদম, প্রশ্ন করতে বলল—"আজ দিদিমণির শরীরটা খারাপ একটু।"

মনে হল যেন রজতের দিকে একটা বিরূপ কটাক্ষ নিক্ষেপ করল। কেন, ঠিক বোঝা গেল না।

খুবই নৈরাশ্যজনক। শুনেছি অফিসে আমার একটা সুনাম বা বদনাম আছে, নাকি বাঘে-গোরুতে একঘাটে জল খাওয়াতে পারি; কিন্তু এ একজোড়া শুধুই গোরু নিয়ে কি করা যায়?

তবু চালিয়ে গেলাম। বাড়িতে কাজ করা বাড়িয়ে দিলাম। ওজুহাত— রজতই একরকম যেটা এনে ফেলেছিল, আজকাল—ঋতু পরিবর্তনের সময়, বিকালের দিকে প্রায়ই মাথাটা টিপটিপ করে। খানিকটা ফল যে না পাওয়া গেল এমন নয়, তবে আসলের দিকে কিছু নয়। দুটো মানুষকে কাছাকাছি এনে

ফেললে জড়তাটুকু যে কেটে যাবেই, সেই পর্যন্ত। আমার মাথা টিপটিপ করলেও রজতের শরীরে ঋতু পরিবর্তনের আর কোনও প্রতিক্রিয়া হতে দেখা গেল না। যেমন ডাকা যায়, বেশ নিয়মিতভাবেই আসতে-যেতে লাগল। সুপর্ণারও শরীর খারাপ বলে আর কদমকে এসে তার হয়ে আমার অফিসঘর গুছোতে হয় না।

অনেকটা সহজ ভাবেই রজত যাওয়া-আসা করে, ঘর থেকে ফাইল নিয়ে আসতে বা কোন বই নিয়ে আসতে, বা অন্য কোন দরকারে। সুপর্ণারও হাত বন্ধ হয় না, নিতান্ত যদি কাছাকাছি হয়ে পড়ে, একটু আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে যায়; তারপর আবার হাত চলে পা চলে।

কিন্তু এর বেশি কিছু নয়। আমার দৃষ্টি খুবই সতর্ক, আর মানবচরিত্র—বিশেষ করে তার চরিত্রের এই দিকটা নিয়ে নাড়াচাড়া করি বলে আমার দৃষ্টি বেশ সূক্ষ্ম—এরকম একটা আত্মশ্লাঘা আছেই; বেশ বুঝলাম—জড়তাটুকু স্বাভাবিক কারণেই যদিচ ভেঙে আসছে একটু, কিন্তু তার অতিরিক্ত এতটুকু কিছুর অঙ্কুরোদ্গমও হয় নি দুজনের কারুর মধ্যে। মনে মনে ধিক্কার দিলাম—তোরা নাকি মানুষ—তোদের নাকি যৌবন—তোদের নাকি সৌন্দর্য! আরে ছিঃ!

নয়

ছেড়ে দেওয়াই স্থির করলাম; একটা ঝোঁকের মাথায় পড়ে কাজেরও ক্ষতি হয়েছে বিস্তর।

পরদিন আর মিথ্যা ওজুহাত নয়, সত্যই শরীরটা ভালো ছিল না। উৎপত্তিটা অবশ্য মনে, ওদিকটা মন থেকে একরকম মুছে ফেলায় বড় ফাঁকা ফাঁকা ঠেকছিল। অফিসে গেলাম, কিন্তু কাজে মোটেই অভিনিবিষ্ট হতে পারলাম না। তারপর বিকালের দিকে সত্যই মাথাটা একটু টিপটিপ করতে লাগল। বাড়ি চলে এলাম।

দিনটাও ভালো ছিল না। একটা থমথমে মেঘে আকাশ রয়েছে ছেয়ে, না আছে হাওয়া, না আছে বৃষ্টি। বারান্দায় আরাম চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসলাম।

একটু পরে যথানিয়ম সুপর্ণা এসে ঘরে প্রবেশ করল। হ্যাঁ, ওকথাটা বলতে

ভুলে গেছি ; ঘড়ির কাঁটার মতো যথা-নিয়মই আমার গৃহস্থালি চলছে আজকাল ; প্রশ্ন করল—"দাদু আজ বড় সকাল-সকাল চলে এলেন যে !"

তারপর, মিথ্যা বলব কি সত্য কথাটাই—একটু ভাবতে আমার একটু যে দেরি হল তার মধ্যেই আবার প্রশ্ন করল—"আজ আর কাজ করবেন না বুঝি ?"

ভুল হতে পারে, কিন্তু কথাটা যেন খট করে লাগল আমার কানে। তাইতে ঘুরে দেখে চোখেও যেন ঠেকল একটা জিনিস নূতন করে ; মনে হল আজ সুপর্ণা যে-ভাবে সেজেছে তাতে অন্যদিনের চেয়ে কোথায় যেন সূক্ষ্ম একটা পার্থক্য আছে।

এটাও ভুল হতে পারে। এখানে আসার পর শহরের হাল-ফ্যাশানে কিছু কিছু নিত্য-ব্যবহার্য সাজ-পোশাক এসেছে সুপর্ণার। খুব শৌখীন নয় মেয়েটা, তবু এক আধখানা করে গায়ে উঠেছে নিশ্চয়। কদম রয়েছে, অঙ্গ-মার্জনাতেও কিছু কিছু উন্নতি হয়েছে নিশ্চয়, হয়তো অন্যদিকে মন থাকায় তেমন করে চোখে পড়ে নি, আজ পড়ল। যাই হোক, একটা রূঢ় ধাক্কা লাগল বুকে, আজ যেন ছিল কোথায় একটা আয়োজন, একটা প্রতীক্ষা ; তাইতে, আমার মূঢ়তায়, আমার অধৈর্যে একটা আঘাত হেনেছি।...হায়, আজকের দিনটাই রজতের আসা রইল বন্ধ !

একটা অনুশোচনা, তারপর সেইটাই উলটে একটা অভিমানে এসে দাঁড়াল, এবং যে উত্তরটা দিলাম তার মূলটাও রইল সেই অভিমানেই। বললাম—"না দিদি, আজ করবার মতন কাজ কিছু নেই আমার আর।"

সুপর্ণা একটু যেন ভীত-বিস্মিত হয়েই ঘুরে চাইল আমার দিকে, ভ্রু দুটি চোখের ওপর চেপে প্রশ্ন করল—"সে কি !"

কথাটা যখন উঠল, একটু ভালো করেই মিলিয়ে দেখি না ; বললাম—"রজত আসবে, তবে তো কাজ হবে।"

সুপর্ণা একটু বিমূঢ়ভাবে চেয়ে রইল, উত্তরটা তো খাপছাড়াও হয়েছে একটু, তারপর বলল—"তাঁর শরীর...বলছিলুম, তাঁকে তো ডেকে পাঠালেই..."

ঘুরে হাতের কাজটা আবার তুলে নিয়েছে, আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল

কথাটা। তখনি কিন্তু আর একবার ঘুরে, অনেকটা যেন নিশ্চিন্তকণ্ঠে প্রশ্ন করল—"শরীর তাহলে আপনার ঠিক আছে তো? যাক্।"

কাজ করে যেতে লাগল।

একটা যে ধাক্কা খেলাম তাইতে অনুশোচনাটা বেড়েই চলল। থমথমে আকাশের দিকে চেয়ে নিজেকে প্রশ্ন করছি—

কতটুকু আমি বুঝেছি, আর কী সুযোগই বা ওদের আমি দিয়েছি যে একটা প্রতিকূল অভিমত তাড়াতাড়ি গড়ে নিয়ে একরকম করে হাত ধুয়ে বসে রইলাম, আর ঠিক সেইদিনটিতেই যেদিন কঠিন মাটি ঠেলে অঙ্কুর বোধহয় একটু মেরেছিল উঁকি-ঝুঁকি। দুজনকে একত্র করেছি ঠিকই, কিন্তু নিজেই যে এদিকে দুজনের মাঝে একটা অলংঘ্য প্রাচীর হয়ে বসে আছি সর্বক্ষণ, সেটা কি একবারও ভেবে দেখেছি?···অথচ এই প্রাচীরেরই দুদিকে দুটি হৃদয় গুমরে গুমরে মরছে সর্বক্ষণ।

তাই যদি না সত্য হয় তো কিসের এই জড়তা যার জন্য চরণ চায় না উঠতে, দৃষ্টি চায় পল্লবের অবগুণ্ঠন; যার জন্য এতই শঙ্কা, এতই বেপথু যে ফুলদানির মতো একটা হালকা জিনিসও স্পর্শমাত্র স্থানচ্যুত হয়ে পড়ে।

কাল ওদের দিয়েছিলাম ধিক্কার; আজ নিজের মনকেই বললাম—এই তোমার যৌবনকে চেনা। লেখক বলে এই তোমার—আত্মশ্লাঘা! ধিক্, শত ধিক্!

আর দেরি করলাম না। তার পরদিন বিকাল হয়ে আসতে—রজতকে আমার চেম্বারে ডেকে আনিয়ে বললাম—"আমার শরীরটা আজও বেশ ভালো নয়, বাড়ি যাচ্ছি, সেখানেই একটু কাজ করব, অনেকখানি জমে গেছে। তুমি ভেরি আর্জেন্ট স্লিপ আঁটা ফাইলগুলো নিয়ে ঠিক আধঘণ্টা পরে পৌঁছে যেও। আমি ডাক্তার রায়ের ওখান থেকে একটু ঘুরে আসব, ফিরতে দেরি হয় তো চলে এসো না যেন।"

শরীর বেশ ভালোই ছিল, তবু ডাক্তার রায়ের ওখানে কাটিয়ে দিলাম কিছুক্ষণ, কিন্তু তিনি দূরে বেরিয়ে গিয়েছিলেন কলে। তবে এ প্ল্যানটা সফল না হলেও অন্য একটা প্ল্যান এঁচে নিতে দেরি হল না। আমি রজতকে যে সময়টা দিয়েছিলাম তার মিনিট পনের আগে চলে এলাম।

কিন্তু ঠিক বাসায় গেলাম না, গেট দিয়ে প্রবেশ করে সোজা বাগানের দিকে

চলে গেলাম। আজকাল বাড়িতে লোক থাকায় চাকর-ঠাকুর আউট-হাউসে শুয়ে থাকে বা আড্ডা মারে। মেয়েরাও বাড়ির ভেতর, এসেছি যে টের পেল না কেউ। বাগানের ওদিকটা থাকলে দেখাও যায় না বাসা থেকে।

যা এক হাঙ্গাম নিয়ে পড়েছি, অনেকদিন আসাও হয় নি এদিকে।

এ প্ল্যানটা আরও জুতসই। ডাক্তার রায়ের বাড়িতে বসে কাটিয়ে দিলে এখানে কি হচ্ছে না-হচ্ছে টের পেতাম না, বাগান থেকে সে-সুবিধাটা আছে, অথচ নিজে বেশ প্রচ্ছন্নও থাকা যায় একটু চেষ্টা করলেই।

অনেকদিন দেখা হয় নি, কিছু আগাছা জন্মে গেছে নূতন বর্ষায়। বর্ষার রজনী গাছের চারা সব বেরিয়েছে, নূতন জায়গা তৈয়ার করে বসাতে হবে, ওদিক ফটকের পানে নজর রেখে জটাধারীকে আদেশ-উপদেশ দিয়ে বেড়াতে লাগলাম। একটু পরেই ডোরাণ্ডার বেড়ার আড়াল থেকে দেখি রজত ফটক দিয়ে প্রবেশ করল। জটাধারী এই সময় নিড়ানী দিয়ে গোটাকতক আগাছা তুলছিল, একটু লক্ষ্য করে দেখবার সুযোগ হল আমার।

রজত আমার ঘরের সামনে গিয়ে একটু ইতস্তত করে দাঁড়াল, তারপর বারান্দায় উঠে গিয়ে আস্তে আস্তে কড়া নেড়ে ডাক দিল—"রামকানাই আছ?"

উৎকণ্ঠায় আমার গলাটা এরই মধ্যে শুকিয়ে এসেছে। একটু নিরাশই হতে হল বৈকি। রামকানাই কপাট খুলে বেরিয়ে এল, আজ ওদিকেই কি করছিল। —যেন দিন বুঝে।

বেশ খানিকটা দূর, একটু নীচু গলায় কথা হলে আর শোনা যায় না। তবু আন্দাজে বোঝা গেল।

রজত জিগ্যেস করছে—বাড়ি ফিরেছি আমি?

রামকানাই বলল—না ফিরি নি তো!…রজত বসবে? বের করে দেবে চেয়ার? না, ভেতরেই বসবে?

রজত ঘরের ভেতর অল্প একটু উঁকি মেরে নিয়ে বাইরেই দিতে বলল চেয়ার। রামকানাই বের করে দিল, আমার ইজিচেয়ারটাও। রজত বলতে রামকানাই আবার ভেতরে গেল। তারপর একটু পরে একটা র্যাশন-ব্যাগ হাতে করে বেরিয়ে এসে ফটক পেরিয়ে বাইরের দিকে চলে গেল।

সুপর্ণা আসার পর থেকে আজকাল খাবার তৈয়ার করায় কদমের পরীক্ষা-নিরীক্ষা একটু বেড়েছে, হয়তো তারই ব্যবস্থা, সঙ্গে উল থাকতে পারে, ক্রচেট সুতো থাকতে পারে, ওদিকেও তালিম দিচ্ছে কদম। যাক, ভালই হল।

এরপর বেশ খানিকক্ষণ একভাবেই কাটল, আমি সেই জায়গাটাতেই ঘোরাঘুরি করছি এটা দেখে, ওটা দেখে ; জটাধারী আগাছা পরিষ্কার করতে করতে আর একটু এগিয়ে গেল।

একটু কি রকম মনে হচ্ছে বৈকি মাঝে মাঝে, মেয়েছেলেদের মতো আড়ি পাতা, এই বয়েসে। কিন্তু সত্যিই একটা বিশ্রী রকম নেশা ধরে গেছে। মনকে প্রবোধ দিলাম, সুযোগ বাড়িয়ে দিয়ে একটা পরীক্ষাই যখন করছি তখন একটু নজর না রাখলে ফলাফল সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হই কি করে? আর, হলে জুড়িটা হয় বড় চমৎকার, লোভ হয়ই একটা।...আরও একটা কথা, আমার যা পেশা তাতে কল্পনায় তো এই জিনিসই ফুটিয়ে তুলতে হয়, তাহলে প্রত্যক্ষ করতে দোষ কোথায়? আমরা লাইসেন্স পাওয়া নয় প্রকৃতির কাছ থেকে? আর সম্বন্ধ-বিরুদ্ধও তো কিছু নয়। স্তোক দিচ্ছি নিজেকে মাঝে মাঝে।

বেশ খানিকক্ষণ গেল। সুপর্ণার তো এবার আমার ঘরে আসবার সময়ও হয়ে এল প্রায়। রক্তও একটু চঞ্চল হয়ে উঠেছে, একটা সময়-চেতনা তো দাঁড়িয়েছেই। বার কয়েকই ঘুরে ঘুরে দেখল, পা দোলাচ্ছিল বসে বসে, সেটা বেড়ে গেল, তারপর একবার ঘুরে দেখে চেয়ারটা আর-একটু ঘুরিয়ে নিয়ে আরও একটু বাইরের দিকেই মুখটা ঘুরিয়ে বসল। তাহলে সুপর্ণা কি এসেছে ঘরের মধ্যে?

কিন্তু মুখ ঘোরালে চলবে কেন? আজ বিধি আমারই অনুকূল। এই সময় আর একটা ব্যাপার হল।

আকাশের অবস্থা কালকের মতো আজও খুব খারাপ, তবে একভাবে চলছে বলে বৃষ্টির আশঙ্কাটা ছিল না মনে। কিন্তু বর্ষাকালের অনিশ্চয়তা, হঠাৎ পুব দিক থেকে একটা দমকা হাওয়া উঠল এবং ছড়ছড় করে গোটাকতক ফোঁটা বাগানের ওপর দিয়ে পশ্চিমের দিকে ছুটে বেরিয়ে গেল। মালী বললে—"বাবু, ঘরে গিয়ে উঠবেন না?"

আমার উৎকণ্ঠা তখন চরমে, সংক্ষেপে বললাম—"হবে না বৃষ্টি।"

আমি দাঁড়িয়ে থাকায় মালীও উঠতে পারল না।

হবেই বৃষ্টি, নামল বলে।…আর নামবে একেবারে আমার পুবমুখো বারান্দা লক্ষ্য করে। ভাবতে ভাবতেই নামলও। রজত ঘাড়টা ঘুরিয়ে একবার ঘরের দিকে চেয়ে নিয়ে উঠে পড়ল। আউট-হাউসের দিকে একরকম ছুটতে ছুটতেই আমি একবার ফিরে তাকে শেষবার দেখলাম—আমার আরাম চেয়ারটা ধরে ঘরের মধ্যে পুরছে।

এমন সার্থক একটি বর্ষা জীবনে আর এসেছে বলে মনে পড়ে না। মনে মনে ইন্দ্রদেবকে ধন্যবাদ দিয়ে বললাম—"তাহলে কলিকালেও দেখছি তোমার রসজ্ঞানটা একেবারে বিলুপ্ত হয় নি।"

ঐ শেষবার দেখলাম রজতকে, বারান্দার পেছনে ঘরের ভেতরটা অন্ধকারই, আজ আকাশের দোষে আরও অন্ধকার হয়ে গেছে, আর দেখার উপায় রইল না।

বর্ষা নেমেছেও খুব তোড়ের ওপর, এত জোর বৃষ্টি বছরে আপাতত এইটেই প্রথম; আমার মনটা ওদিকে আর পথ না পেয়ে এইদিকেই চলে এল। অনেকক্ষণ কাটল। বড় করুণ মনে হচ্ছে পৃথিবীটাকে। নিয়তিই যেন সব, এক-একটা জায়গায় ট্রাজেডি স্কেল হতেই হবে। প্রতি মুহূর্তেই নূতন নূতন সুযোগ আসছে, মন্থর গতিতে যাচ্ছে চলে, তারপর যখন সব একেবারে নিঃশেষ তখন হয়তো ভাঙল তন্দ্রা, তারপর সমস্ত জীবন ধরে শুধু হাহাকার হয়ে রইল সম্বল।

বোধহয় বর্ষার আমেজে চিন্তাটা এই পথ ধরেছে বলেই হঠাৎ খেয়াল হল যতটা সম্ভব নিঃসন্দেহ হতে হবে। সুপর্ণা এয়েছে কি ঘরে?....এসে ফিরে যায় নি তো?

জটাধারীকে বললাম—"ওরে মস্তবড় একটা ভুল হয়েছে। স্টেনোগ্রাফার রজতকে আসতে বলেছিলাম। টোকাটা মাথায় দিয়ে যা দিকিন একবার। যদি এসে থাকে বলবি চায় তো চলে যেতে।…যা।"

জটাধারী বলল—"তার চেয়ে আপনার ছাতা আর বর্ষাতি কোটটা চেয়ে নিয়ে আসব? ভিজেও রয়েছেন।…উনি এখন যেতে পারবে কি?"

এইটেই সাধারণ বুদ্ধির কথা। ভেবে দেখতে পারি নি বলে রাগও হল ওর ওপর। বললাম—"তোকে যা বলি তাই কর, ব্যাটা মুরুব্বিয়ানা করতে এসেছে।...আমার শরীর খারাপ, এর ওপর আর একটুও ভিজলে চলবে না। আর শোন, ওদের বলবিনিও যে এখানে আটকে পড়েছি আমি। বলবি বাবু বাইরে গেছে, যাওয়ার সময় বলে গেছল—যদি স্টেনোবাবু আসে চলে যেতে বলিস। বুঝলি?"

যাই বুঝুক, ঘাড় নেড়ে টোকা মাথায় দিয়ে নেমে গেল।

এই ছোটখাট প্রতিকূলতায় জিদটা যেন আরও বেড়েই যাচ্ছে। কিন্তু ভুল করলাম। চমৎকার জায়গাটিতে ছেড়ে দেওয়ার সুযোগ এসেছিল সেদিন। অজ্ঞতাই সোনা ফলাত; এ যেন কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ বেরিয়ে পড়ল।

একটু পরেই একরকম হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল জটাধারী। হাঁপাচ্ছে।

বিস্মিত হয়েই প্রশ্ন করলাম—"কি রে, বলে এলি?"

বলল—"না বাবু, যা চোখে দেখলুম তাতে আর মুখে রা সরে?...অথচ জানি এই কাণ্ডটা নিত্যি হচ্ছে বাড়িতে হুজুরের চোখে ধুলো দিয়ে।"

"কি হচ্ছে?"

"ঐ কদম হুজুর..."

"কদম!!" শিউরে উঠেই তখনই আবার সামলে নিয়ে গলা সহজ করে প্রশ্ন করলাম—"তা কি করেছে কদম?"

"হ্যাঁ, ঐ কদম, কানাইদার ইস্তিরি। লোক ও কোনকালেই ভালো নয় হুজুর, শুধু হুজুরকে ভাঁড়িয়ে সতীলক্ষ্মী সেজে..."

ধমক দিয়ে বললাম—"যা দেখেছিস ঠিক করে বলে যা কপচানি ছেড়ে। কি করেছে কদম?"

"স্বচক্ষে দেখলুম হুজুর, মিছে বললে গলে যাবে চোখ। ঘরে পা দেব দেখি ওদিককার দরজা অর্ধেক ভেজিয়ে কদম লুকিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে শুধু মুখটুকু আর বুকের এতটা বেরিয়ে। পা দিতেই অদিশ্য হয়ে গেল।"

আর একটু সামলে নিলাম। গলা আরও সহজ করে নিয়ে বললাম—"কাকে দেখতে কাকে দেখেছিস। কদম নয়, আজকাল সুপর্ণা ঘর গোছায়, তাই বোধ-হয় আসছিল, বৃষ্টিতে অত বুঝতে না পেরে নতুন লোক ভেবে সরে গেছে।"

এত অল্পে ছাড়ে? কতদিনের আক্রোশ পোষা রয়েছে বুকে। বলল—"ঐ কদমই হুজুর—কানাইদার পরিবার। আমার চোখে তো ধুলো দিতে পারে না। দিদিমণি নীলাম্বরীটা দিয়েছে সেইটে সমস্ত দিন পরে আছে আজ, গোলমাল কি করে হবে বলুন, লাখের মধ্যে চেনা যায়…"

হাসিও পায় এত ঘা খেয়েও হতভাগাদের নজরের দোষ গেল না। চাপা দিয়ে বললাম—"হয়েছে। আর কাকে দেখলি ঘরে? সুপর্ণা ছিল?"

"না হুজুর, তিনি ছেল না।"

"ভালো করে দেখেছিস?"

"কেউ ছিল না হুজুর। একটা গোটা মানুষ ঘরে রয়েছে আর দেখতে পাব না? ইলেক্‌টিরি লাইট জ্বলছে উদিকে।…আর ঘরে তৃতীয় ব্যক্তি থাকলে অমন করে ও আধ-লুকুনো হয়ে…"

জিগ্যেস করলাম—"রজত ছিল?…করছিল কি?"

"আজ্ঞে, উনি ছেল বৈকি। তাগটা তো ওনারই ওপর। তা উনি যাকে সতীলক্ষ্মী বলতে হয় হুজুর। হুজুরের টেবিলের সামনে বসে টেবিল ল্যাম্পটা জেলে একভাবে বসে বই পড়ছে—কে উঁকি মারছে, কি অভিপ্রায় নিয়ে, ভ্রূক্ষেপ নেই—যেন যাত্রার দুর্ব্বাশামুনি তপিস্তেয়…"

বললাম—"তাহলে কিছু বলিস নি রজতকে?"

"ঐ যে বললুম, মুখ দিয়ে রা সরবে তবে তো বলব হুজুর; যেমন গেলুম সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এলুম, উনি তো টেরও পেলে না যে একটা লোক এল আর বেরিয়ে গেল।…ছুটে এলুম—একবার বলি গিয়ে জলঢোঁড়া মনে করে দুধ-কলা দিয়ে কি কাল-নাগিনীই না…"

বললাম—"আচ্ছা যা, নিয়ে আয় গিয়ে ছাতাটা, আর বর্ষাতি কোটটাও আনবি; বলবি বাবু আটকে গেছেন আউট-হাউসে।"

কাজে বসা আর সম্ভব ছিল না, একটু পরে বৃষ্টিটা ধরতেই রতনকে বাড়ি পাঠিয়ে দিলাম। নিজে চেয়ারটা বারান্দায় টেনে নিয়ে এসে গা এলিয়ে দিলাম।

গাটা সিরসির করছে; লজ্জায়, ঘৃণায়। লজ্জাটা এইজন্য যে আমি এইরকম একটা মেয়ের হাতের খেলার পুতুল করে তুলেছিলাম নিজেকে! ও কোন স্তরের একদিনের তরেও ভাবি নি, মনে করেছিলাম—নিকষে যখন খাঁটি সোনার দাগ পড়ছে তখন আর অত ভাববার কি আছে? শুধু মেকি নয়, এত মেকি যে জহুরির চোখেও ধুলো দিলে! পরাজয়ের লজ্জা যেন রাখবার জায়গা পাচ্ছি না।

চাকররা মুখ টিপে টিপে হাসবে এবার।…আর, ও তো সর্বক্ষণই হেসে এসেছে।

এখন, এ খেলার শেষ কোথায়? ভয় পেয়েছিলাম—এমন সাজানো তাসের ঘর, একটু অসাবধান হলেই ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। এখন দেখছি তাসের ঘর কোথায়? পাকা বুনিয়াদের ওপর এমারত তুলেছে শয়তানী, ভেঙে নামাই কি করে?

দুশ্চিন্তার কথা আরও এই যে দুটি নিরীহ প্রাণীকে এর মধ্যে এনে তুলল; তার মধ্যে একজনের মায়ের মর্যাদা। তিনি যে এই অশুচি গৃহের দেয়ালের মাঝখানে রয়েছেন এতে অপরাধীর অনুশোচনায় দগ্ধ করে দিচ্ছে আমায়।

সন্ধ্যা পর্যন্ত একভাবে বসে রইলাম। এর মধ্যে কখন সুপর্ণা এসেছে, আজকাল যেমন করে, গল্পে টানবার চেষ্টা করেছে, তারপর নিতান্ত সংক্ষিপ্ত অন্যমনস্ক উত্তর পেয়ে আর বেশী চেষ্টা না করে কখন কাজ সেরে চলে গেছে টেরও পাই নি।

মাথাটা উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। একটা হেস্তনেস্ত করে ফেলতে হবে, এ পাপ আর এক মুহূর্তও পুষে রাখা যায় না। ওকে একা তাড়ানো শক্ত হয়, রামকানাই

পর্যন্ত যাক। নিরীহ, কিন্তু এত নিরীহ হওয়াও অপরাধ, এদের আশ্রয় করেই তো পাপ বুক ফুলিয়ে বেড়ায় সংসারে।

সত্যসত্যই একটা সুযোগ হাতে এল। সামান্য, কিন্তু অসামান্য করে তোলা যায়।

সন্ধ্যা জ্বলে নি কেন এখনও? একটা লোক যে বসে রয়েছি।...

ঠিক এই সময় রামকানাই বাইরে থেকে এল, ভরা র‍্যাশনের থলিটা হাতে করে। ভেতরের দিকে চলে যাচ্ছিল, আমি ডাক দিলাম—"এদিক হয়ে যাবে। ...গেছলে কোথায়? এদিকে যে..."

ঐ কথাই বলতে যাচ্ছিলাম—"এদিকে যে অন্ধকারে ঘর ভরে গেল, আলো পর্যন্ত জ্বলে নি!" ঐ হত সূত্রপাত। তারপর যে উত্তরই দিক না কেন, কথাটা বাড়িয়ে তুলে সঙ্গে সঙ্গে কাজ থেকে বরখাস্ত।...কাল সকালেই চলে যাক।

কথাটা শেষ করবার আগেই দপ করে ভেতরে আলোটা জ্বলে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে আমিও।

কদম। ঠিক যে দেখলাম তা নয়, শুধু কড়া আলোর নীচে একটা নীলরেখা; ওর সেই নীলাম্বরী। আমি চীৎকার করে উঠলাম—"কে আলো জাললে!!... একটু ঠাণ্ডায় বসে আছি।...না হলে তো নিজেই..."

—বলতে যাচ্ছিলাম—"না হলে তো নিজেই জেলে নিতে পারতাম।"

কিন্তু হঠাৎ যে কী হয়ে গেল! আমার গলা ওর অর্ধেক কখনও ওঠে নি বাড়িতে। এদিক থেকে মালী ছুটে এল, ভেতর থেকে ঠাকুর; তারপর আস্তে আস্তে শঙ্কিত পদক্ষেপে সুপর্ণাও এসে চৌকাঠের ওদিকে দাঁড়াল। সবার মাঝখানে, সবার দৃষ্টির নীচে দাঁড়িয়ে আছে কদম; কোনখানে যে চোখ রাখবে যেন বুঝতে পারছে না; অত কড়া আলোতেও মনে হচ্ছে যেন একটা ছাই দিয়ে গড়া মূর্তি। এতটুকু উচু কথা কখনও শোনে নি তো।

বেশ একটু পরে শুকনো গলায় বলল—"তাহলে নিবিয়ে দিই বাবাঠাকুর?" —তাহলে অন্ধকারে ডুবে গিয়ে বাঁচে যেন।

এরপর ঠিক কি ভাবে কি হল বুঝিয়ে বলতে পারব না। তবে ওদিকে আর এগুতে পারলাম না। হতে পারে হঠাৎ যে চরমে উঠে গিয়েছিল

ব্যাপারটা, তার প্রতিক্রিয়া ; হতে পারে স্নেহ অন্ধ ; হেস্তনেস্ত করার কথা তো ভুলেই গেলাম, অষ্টপ্রহর একটা বেদনা লেগে রইল মনে, কি করে বেচারির মনের গ্লানিটা মুছে ফেলা যায়। বিরুদ্ধ যুক্তিগুলাও মনে এসে উঁকিঝুঁকি মারতে লাগল : নালিসটা ওর বিরুদ্ধে করলে এসে কে, না, জটাধারী ; শিভ্যাল্‌রি দেখাতে গিয়ে ক্রমাগত ধাক্কা খেয়ে খেয়ে যে আক্রোশে ফুলছে।...দেখেছে তো স্পষ্টই বোঝা যায় সুপর্ণাকে, ঠিক ঐ সময় তার ঘরের মধ্যে আসবার কথা, আমার প্ল্যান তাই।...নীলাম্বরী শাড়ি! ওর মুণ্ডু! হতভাগা সমস্ত দিন নীলাম্বরী শাড়ির স্বপ্ন দেখেছে, অন্য কথা আসে মুখে ?

বাড়িটা থমথম করছে দুদিন ধরে। আর একটা আপশোসের কথা, যার কোন উপায় করে উঠতে পারছি না,—সুপর্ণার মুখটা বড় গম্ভীর ; শুধু গম্ভীর হলেও ছিল একরকম, যেন লজ্জায় ছেয়ে রয়েছে অষ্টপ্রহর। অমন যে হাসিঠাট্টায় প্রাণময় হয়ে থাকত, এখন বিশেষ করে আমার মুখের ওপর যেন চোখ তুলে রাখতে পারছে না।

প্রথমটা অত বুঝতে পারি নি, তারপর সন্দেহটা মনে ওঠা পর্যন্ত যেন কি করব কোথায় যাব ভেবে উঠতে পারছি না।

—ওকি ভাবলে বাড়িতে ওরা দুজন বাজে লোক এসে ভিড় করে আমার অমন মিষ্টি মেজাজটা রুক্ষ করে তুলেছে হঠাৎ ; ছটফট করছি ভেতরে ভেতরে।

সন্দেহর যা রীত, পথ খুঁজে খুঁজে ছড়িয়েও চলল।—

আজকাল আমার খাবার সময় সুপর্ণা বসে সামনে পাখাটা নিয়ে। কদমও থাকে, সামনের একটা থামে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে। দয়া-মাসীমাও আসেন মাঝে মাঝে, জপ যদি ওদিকে শেষ হয়ে গেল।

সময় খারাপ হলে, কুচিন্তা অদৃষ্টে লেখা থাকলে যোগাযোগও তো তেমনি হয়। সেদিন হঠাৎ উনি মালা হাতেই এসে উপস্থিত হলেন।

কদম বলল—"বসবেন ঠাকরুনমা ? আসনটা পেতে দিই ?"

দয়া-মাসীমা বললেন—"মালা হাতে রয়েছে যে...."

শুচিবাই-গ্রন্থের ইঙ্গিত, অর্থাৎ শূদ্র আসন এনে দিলে চলবে না।

সুপর্ণা উঠে পড়ে বলল—"কম্বলেরটা এনে দিই ঠাকুরঘর থেকে।"

ও যতক্ষণে ফিরল ততক্ষণে মাসীমা আরম্ভ করে দিয়েছেন প্রসঙ্গটা।

আমি জিগ্যেস করেছি—"কেমন লাগছে মাসীমা জায়গাটা?"

বলছেন—"লাগছে ভালোই বাবা। গিরির অক্ষয় বৈকুণ্ঠবাস হোক, কেউ না হয়েও ছেলের বাড়া করছ, ভালো লাগবে না? তবে ঐ যে এক লেজুড় বাবা। পার না হলে সগ্‌গে গিয়েও শান্তি আছে?"

ঠিক এই সময়ই সুপর্ণা এল। শেষের কথাগুলা কানে যেতে আসনটা পেতে দিয়ে তাড়াতাড়ি চলে গেল।

আমি বললাম—"ওর জন্যে আপনি ভাবছেন কেন এত? পড়ে থাকবে?"

—দুদিন পরে একটা বলবার মতো কথা পেয়ে বেশ উৎসাহের সঙ্গেই আরম্ভ করলাম আমি।

"অবিশ্যি পড়ে থাকবে না···"

দয়া-মাসীমা হঠাৎ থেমে গেলেন। তারপর কদমের দিকে মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে বললেন—"তুই না হয় একটু উদিকে যাবি বাছা? আমাদের মায়ে-বেটায় একটু কথা আছে। না হয় সুপার সঙ্গেই একটু গপ্প করগে যা না।"

একটু যে খোশামোদও করলেন তার কারণটা তো সুস্পষ্টই; বললেন—"আহা মিলেছেও দুটিতে তেমনি; কে বলবে যে মায়ের পেটের বোন নয়?"

আমি দুদিন থেকে যে সুযোগটা খুঁজছিলাম—কদমের মনটা পরিষ্কার করে দেওয়ার—অপ্রত্যাশিত পথেই হঠাৎ সেটা এসে গেল; আমিও আর দ্বিধা করলাম না, বললাম—"না মাসীমা, ওকে থাকতে দিন। ওই তো একা বোঝে এসব কথা, ব্যবস্থা যা করবার ওই তো করবে। আপনার বোন-পোকে তো দেখছেন। কদম না থাকলে ওকে ডেকেই নিতে হবে বরং।"

নীচু হয়েই খেতে খেতে বলছিলাম, ওরদিকে মুখ তুলে বললাম—"কিরে, নয় কি?"

বেশ বুঝলাম কদম হঠাৎ একটু আড়ষ্ট হয়েই শুনছিল, চোখাচোখি হতেই একটু হেসে বলল—"বাড়ান যত বাড়াবেন।···না হয় সরেই যাচ্ছি একটু।"

দয়া-মাসীমা একটু অপ্রস্তুতই হয়ে পড়েছিলেন সরাবার কথাটা বলে, একটু যেন

ভাবছিলেন, বললেন—"তাহলে থাকই।...হ্যাঁ, সেকথা একশ বার, চৌকোশ মেয়ে বৈকি।"

আমার আন্দাজটা আরও পুষ্ট হল একটু; একটা বড় লোভ দেখিয়েই কদম নিয়ে এসেছে দয়া-মাসীমাকে, আর স্বর্ণার বিয়ের চেয়ে ওঁর বড় লোভ আছেই বা কি এখন?

মাসীমা বলে চলেছেন—

"কী যেন বলছিলুম।....ভীমরতি হয়েছে, আর মনেও থাকে না, সেই জন্তেই তো আরও ভাবনা, চক্ষু বুজলে হবে কি মেয়েটার!...এই জন্তেই এসে বোঝা হয়ে উঠেছি বাবা। জোর নেই, কিন্তু আমার বোঝা ঘাড় থেকে না নামিয়ে দিলে নড়বও না। কোথায় যাব বাবা আমার, কে দেখবে? এই তো দেখতেই পাচ্ছ, আনছি-করছি এই করতে করতে ধাড়ী হয়ে উঠেছে মেয়ে...." আমার বুকের ভেতরটা মোচড দিয়ে উঠল। ভাবছিলাম, কালামানুষ, আলো জ্বালা নিয়ে গোলমালের কথাটা ওঁর কানে যাবে না। এখন বুঝলাম নিজে না শুনতে পেলেও ওঠেছে কানে, স্বর্ণাই তুলে দিয়েছে নিশ্চয়, তাই মালা হাতেই ছুটে এসেছেন—কত নিরুপায় হয়ে যে ঘাড়ের বোঝা হয়ে উঠেছেন জানিয়ে দিতে। হঠাৎ রাগের মাথায় কী যে একটা ভুল করে বসলাম কাল! আমি দাওয়ার কথাটা এড়িয়ে গিয়ে বললাম—"একেবারে ধাড়ী হয়ে গেল মাসীমা?—কুড়িও পেরোয় নি? আজকাল.. তুই কি বলিস গো? কথা কইছিস না যে?"

খুব উৎকণ্ঠিত হয়েই শুনছিল কদম, হঠাৎ যেন সামলে নিয়ে একটু হাসল, বলল—"না, তেমন আর কি? আজকাল শহরে তো অমন ঘরে ঘরে; দেখছি তো।"

দয়া-মাসীমাও উৎকর্ণ হয়ে শুনছিলেন, বললেন—"তাহলে তোমাদের দুজনের মুখেই যখন ঐ কথা তখন আমিও ভরসা করে বলি। ভালো নয়, ঘরে ধুমড়ো মেয়ে পড়ে থাকাটা কস্মিন কালেও নয় ভালো; তবে এ-যেমন দাঁড়াচ্ছে তাতে তো মন্দ হয়েও ভালোই বলতে হবে।"

বললাম—"তা বৈকি, আজকাল একটা অল্পবয়সের মনের মতন পাত্র পাচ্ছেন কোথায় আপনি? এদিকেও যেমন আঠার-উনিশ-কুড়ি ওদিকেও তেমনি

ছাব্বিশ, সাতাশ, তিরিশ; একটু নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে না পারার আগে তো করতে চাইছে না বিয়ে কেউ।"

"কে চাইছে, কে চাইছে না সে খোঁজে আমার কি দরকার বাবা? আমি তোমায় জানি। তুমি আমায় এ দায় থেকে উদ্ধার করে দাও। তারপরও যদি মনে কর বোঝা হয়ে আছি..."

অনুতপ্ত কণ্ঠে বললাম—"বোঝা হওয়ার কথা আপনি বার বার করে বলে এত লজ্জা দিচ্ছেন কেন মাসীমা? না হয় খুঁটিয়ে ধরতে গেলে রক্তের সম্বন্ধটুকুই নেই, কিন্তু ছোট বোনের মতনই আমার মাকে একদিন···"

এতই ভার হয়ে রয়েছে মনটা দুদিন থেকে, মার কথা উঠতেই গলাটা যেন রুদ্ধ হয়ে এল। তবে সময়েই সামলে নিলাম ঠাকুরকে বললাম—"আর একটু ডাল নিয়ে এসো।"

তারপর ওদিক থেকে একেবারে অন্যদিকে চলে এলাম, বললাম—"এই গেল আপনার নিজের কথা। কত পুণ্যে পেয়েছি, মাথায় করে রাখব না? তারপর বাকি থাকে সুপর্ণা। তা, সম্বন্ধটা যেমন—ও বোঝা হয়ে থাকবে কি, আমার জীবনটা পর্যন্ত যেন হালকা ফনফন করে দিয়েছে।"

একটু হেসে কদমের দিকে চেয়ে বললাম—"কি গো, মিছে বলছি?"

কদম অল্প হেসে মুখটা একটু ঘুরিয়ে নিল, বলল—"তা···নাতনীই যখন···"

যাক, এদিকটা একরকম সুধরে এনেছি। মুখ তুলে ওদিককার ঘরের দিকে দৃষ্টি ফেলে বললাম—"তা গেলেন কোথায় তিনি হাওয়া করতে করতে?"

দয়া-মাসীমা একটু হাসতে হাসতে উঠে পড়লেন। বললেন—"আমি যাই এখন—জপ করতে করতে উঠে এসেছি।···আর, আমার আবার জপ!"

একটু রাগ দেখিয়েই বললেন—"কোথায় গেল? এসে করুক না হাওয়া একটু। বেটাছেলের হয় খাওয়া নৈলে?"

একটু দেরি হবেই। সুপর্ণা একটু লজ্জিত ভাবে এসে সামনে বসে পাখাটা তুলে নিল।

বললাম—"হ্যারে দিদি, কী মাথায় সাঁজ করিয়ে দিয়েছিস বুড়ীর—সব বোঝা হয়ে এসেছি, বোঝা হয়ে এসেছি বলে!"

স্বপর্ণা একটু হেসে বলল—"ভাগো! আমি কেন বলতে গেলুম দাদু!.....
আর আমি তো জানি উলটে বরং হালকা ফনফনে করে দিয়েছি দাদুকে!"

বেশ সজোরেই হেসে উঠে বলল—"শুনলুম তো পান সাজতে সাজতে।"

কদমও হেসে মুখটা ফিরিয়ে নিল।

বললাম—"নাও, এখন যা করছ।..... তা বলে এত হালকা করতে পার নি এখনও যে হাওয়া করলেই খইয়ের মতন উড়ে যাব।"

এগারো

সেদিন সন্ধ্যার পর আমি বেড়িয়ে আসতে রেওয়াজ মতো রামকানাই আরামকেদারাটা বারান্দায় পেতে দিয়ে তামাক দিয়ে গেল। একটু পরে বিদ্যুতের আলোয় একটা ছায়া পড়ল ঘরে, ঘুরে দেখি কদম এসে দোরের পাশে দাঁড়িয়েছে। প্রশ্ন করলাম—"কিছু বলবি?"

কদম গলাটা যেন একটু চেষ্টা করেই পরিষ্কার করে নিল, কিছু উত্তর করল না।

বললাম—"তা সামনে এসে দাঁড়া না।"

এগিয়ে এসে দোরের সামনের দিকের পাল্লাটায় ঠেস দিয়ে দাঁড়াল। আমি আন্দাজ করেছি ব্যাপারটা। আর কিছু না বলে আস্তে আস্তে গড়গড়া টেনে যেতে লাগলাম।......গুছিয়ে নিক ভালো করে নিজেকে।

একটু পরে কদম বলল—"বলছিলুম বাবাঠাকুর, আমার তো কাজ একরকম শেষ হল, এবার না হয় যাই ফিরে?.......অনেকদিন হয়েও গেল।"

একটু সাজিয়ে নিতে হল কথাগুলা; বললাম—"কাজ শেষ হল, না, আরম্ভ হল কদম? শেষ হওয়া মানে বোধহয় বলছিস চাকর-বাকরগুলোকে ধাতস্থ করে দিয়েছিস কতকটা। স্বীকার করি, করেছিস; কিন্তু আমি এদিকে যে এক হাঙ্গাম করে বসে আছি।....."

"ঠাকরুন-মা আর দিদিমণির কথা বলছেন তো? সে হাঙ্গাম তো আমিই করেছি বাবাঠাকুর।......তবে ওঁরা তো এবার চলেও যাবেন......"

আমি বেশ শঙ্কিতভাবেই মুখ থেকে নটকাটা সরিয়ে নিলাম, প্রশ্ন করলাম—"বলেছিস নাকি তুই যেতে!"

[illegible] বলল— তা কখন পারে ? আর, বলবার মালিকও যেন আমি !……কথা হচ্ছে, সকালবেলায় তখন শুনলুম তো আপনি দিদিমণির ভার তুলে নিলেন। একটা ঠিক হয়ে গেলে উনিও নিজের জায়গায় চলে যাবেন, ঠাকরুন-মাও ঝাড়া-হাতপা, বলছিলেন আর দেশ নয়, একেবারে কাশী।"

গড়গড়া টেনে যেতে লাগলাম, তারপর একেবারে সোজা কথাটাতেই এসে পড়লাম, বললাম—"এ তোর নিজের মুখের কথা নয় বাছা; তাহলে আমি বলি ?"

কদম অল্প নড়ে দাঁড়িয়ে একটু কাষ্ঠহাসি হেসে বলল—"বলুন না !"

"কালকে একটু ব্যাপার হয়ে গেল আচমকা কি করে, তাইতে তোর এ অভিমান। বল্—না।"

বোধহয় একটু হকচকিয়ে গিয়েই কদম সঙ্গে সঙ্গে উত্তরটা দিতে পারল না। আমিও এদিকে আর সময় না দিয়ে আরম্ভ করে দিয়েছি।—

"না, হঠাৎ রাগটা হয়ে গিয়েছিল, অস্বীকার করব না। তুই তো জানিসই কী ভোগানটাই ভোগায় এরা বাছা, তুই তো বলছিস দিব্বি সামলে দিয়ে যাচ্ছিস।…· বাগানে গিয়ে দেখি মালীটা একেবারে জঙ্গল করে রেখেছে, পা বাড়াবার জো নেই। বিষ্টিতে আটকে গিয়ে মনটা আরও গেছে খিঁচড়ে, এসে বসেই আছি, বসেই আছি, ঘরে আলো জ্বালবার নাম নেই। একটু পরে গুণধর ধিকুতে ধিকুতে হাজির। ঐ রামকানাই আর কি।

"ধমক দিয়ে বারণ করতে যাব যেন আজ রাত্তিরে আমার ঘরে আর না জ্বলে আলো—বল না বাছা, হয় না রাগ ? তা সঙ্গে সঙ্গে সেই আলো জ্বলে উঠল এদিকে। জানি কি তুই এসে জ্বেলেছিস ?—ভাবলুম তেরস্পর্শের ছুটি তো হল, এখন বাকিটি—মানে, ঠাকুর বোধহয় শেষ কোপটা বসাতে এল, আর রাগটা সামলাতে পারলাম না।

"তারপরেই ঘুরে দেখি, না, ঠাকুর নয়, তুই।"

কদম কথাটা ঘুরিয়ে নিল একেবারে, বলল—"আমিও তো আলোটা জ্বেলে দিয়ে যেতে পারতুম। তা ঠাকরুন-মার বাতটা দিন বুঝে চাগিয়েছে, মালিস করতে করতে একেবারেই খেয়াল ছিল না। তারপর হঠাৎ মনে পড়ল, ওমা !…"

আমি কথাটা কেড়ে নিয়ে হেসে বললাম—"ওমা, আজ যে আমার কপালে বকুনি লেখা আছে! শুনে আসতে হবে না?" কদমও হেসে উঠল। বললাম—"তাহলেই বোঝ, নিজের মুখেই বলছিস মাসীমার ঐ অবস্থা, একজন সারাক্ষণ ওঁকে নিয়ে থাকলেই চলে কাজকর্ম ভুলে; অথচ এদিকে যাবি বলে মতলবও ঠাহর করেছিস……"

একটু চুপচাপই গেল, তারপর ওই বলল—"তাহলে যেমন বলেন; হুকুম না পেয়ে তো নড়বার উপায় নেই।" বললাম—"ভেবে দেখ্ না, যদি মনে করিস যায় হুকুম দেওয়া এ অবস্থায় তো না হয় যা।"

একটু ভাবল কদম, তারপর বলল—"তাহলে বাবাঠাকুর একটা কথা বলে রাখি এখন থেকে,—দিদিমণির বিয়ে হয়ে এঁদের হাঙ্গামা মিটে গেলে কিন্তু ছেড়ে দিতে হবে আমায়।"

এমন আব্দারের সুর টেনে বলল, বেশ বোঝা গেল মনের গ্লানিটা একেবারে মিটে গেছে। বললাম—"তখনকার কথা তখন। ·····কলকেটা নিয়ে যা।"

কদমের ব্যাপারটাও আপাতত এইভাবেই শেষ হল।

কেন, তা ঠিক বলতে পারব না। যেমন বলেছি হয়তো স্নেহ অন্ধই; কিম্বা হয়তো নিরীহতা নিজের প্রমাণ-সাক্ষ্য নিজেই বহন করে। তা ভিন্ন যে-মুখে নালিশ, তাতেও আমার কাছে ব্যাপারটা একটু হালকা করে ফেলেছিল। অবশ্য শেষ পরিণামটা নির্ভর করল দাবড়ানি খেয়ে ওর নিরুপায় আতুরভাবে সবার মাঝখানে সেইভাবে দাঁড়িয়ে থাকাটা।

ভুল হোক, যাই হোক, আপাতত মিটে যেতে বুকটা যেন হালকা মনে হল অনেকটা।

সত্যকথা বলতে কি রজতের দিকে আমার সন্দেহটা মোটেই এগুতে পারল না। তার কারণ অবশ্য এ নয় যে জটাধারী তাকে 'সতীলক্ষ্মী' বলে অমন সার্টিফিকেটটা দিলে। আসল কারণটা কি এক্ষেত্রেও বলতে পারব না; স্রেফ এইটুকু মনে হল—রজতও যদি এ-ধরনের হয় তো মানুষ সম্বন্ধে আমার ধারণাটা যাবে উলটে। বলেছি, এ সম্বন্ধে আমার একটা অনড় আত্মবিশ্বাস বা আত্মশ্লাঘা আছে। তবুও ওকে বাসায় ডাকিয়ে আনা দিনকতকের জন্য বন্ধ রাখলাম।

তাতে রজত যেন বাঁচল। তার কারণ যদি এই হয় যে সুপর্ণাকে নিয়ে সঙ্কোচের ব্যাপারটাই অন্তর্হিত হল, তবু ভেতরে কোনরকম গলদ থাকলে অন্য দিক দিয়ে একটু সূক্ষ্ম চঞ্চলতা দেখা দিতই। যেরকম সতর্ক আছি, আমার দৃষ্টি এড়াতেও পারত না; তা, একেবারে কিছু নয়।

এর ওপর, যা একেবারেই ভাবতে পারি নি,—দেখলাম সুপর্ণাও যেন বাঁচল। ও যেন আরও মুক্ত, আরও প্রফুল্ল হয়ে উঠেছে হঠাৎ। এর আসল কারণ অবশ্য টের পেলাম অনেক পরে, একেবারে সেই শেষের দিকে; তবে সন্থ সন্থ ফল এই হল যে আমি আমার ঘটকালি বা নীরব দৌত্য—যাই বলা হোক, সেটা আবার আরম্ভ করে দিলাম।

ফল সেই একই। এবারে আর-একটু সক্রিয়ভাবে আরম্ভ করেছি। পুরোপুরি বর্ষা নামাতে সুবিধাও হয়েছে। বেশির ভাগ ঘরেই বসি, ঘরটাকে একটু বেশি করেই অগোছ করে রাখি যাতে সুপর্ণাকে বেশিক্ষণ থাকতে হয়, সঙ্কোচটা ভালোরকম করে কেটে যায়। গেছেও অনেকটা কেটে।

কথাবার্তা চালু করবারও ব্যবস্থা করেছি।

বাইরের বারান্দায় বসেই ডিকটেশন্ দিচ্ছিলাম, সুপর্ণা অল্পক্ষণ হল ঘরে এসেছে। প্রশ্ন করল—"দাদু, আপনার ঘরে কি নাচ হয়ে গেছে? ডাকলেন না?"

আড়ষ্ট ভাবটা কাটার সঙ্গে আমায় নিয়ে দরকার পড়লে এরকম ঠাট্টা একটু-আধটু হয় আজকাল। ফাইলের ওপর চোখ বোলাতে বোলাতেই বললাম—"তোমায় নাচবার জন্যে ডাকতে পারি ভাই। নাচ দেখবার জন্যে ডাকব কেন? ...কি ব্যাপার বলো তো?"

"সে-নাচের কথা বলছি না, ভূতের নেত্য। একটি ঘণ্টা আমার লাগবে আজ সুমরে নিতে।"

একবার আড়ে দেখে নিয়ে সেইরকম অন্যমনস্ক ভাবেই বললাম—

—"আমার ঘরের ভাগ্যি; ভূতকে দেখতে পেলে পুরস্কার দিতুম।" ঘাড়টা তুলে বললাম—"টেবিলের ওপর থেকে ফরেন্ ডেস্‌প্যাচ ফাইলটা দিয়ে যেতে পারবে একটু?"

সুপর্ণা সংক্ষিপ্ত উত্তর দিল—"আর, যাকে গোছাতে হবে তার ভাগ্যে ঠাট্টা।"

—ইংরাজী কথা দুটো নিয়ে মন্তব্যটা।

রজতই একটু মুখ টিপে হেসে উঠে গিয়ে ফাইলটা নিয়ে এল। সবই বেশ পরিকল্পনামত চলছে, আমি রজতকে বললাম—"ওকে বুঝিয়ে দিও তো কোন্‌টে কি ফাইল। কখনও কখনও বাইরে রয়েছি, দরকার পড়লে নিজেকেই ছুটে যেতে হয় ঘরে। তুমি যখন নেই আর কি ?"

সুপর্ণা আমার দিকে একটু চোখ ফিরিয়ে বলল—"তারপর আর কি, কাজটাও আমার সুপর্ণা করে দিক।"

আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল—"ক্ষতি কি, ভালো স্টেনো রয়েছে যখন।"

বাড়াবাড়ি হয়ে গেল বৈকি, উচিত ছিল না কথাটা বলা ; কিন্তু হঠকারিতা তো এই জিনিসই। বিবেচনা করে দেখবার অবসর দেয় না তো। বাড়াবাড়ি হল বটে, কিন্তু আমার কোন অনুশোচনা নেই তার জন্য। ভাবলাম আমার সংকল্প যখন স্থির তখন এরকম একটু আধটু না হলে রস জমবে কি করে ?

হঠকারিতার সদ্য ফল এই হল যে সেদিনকার প্ল্যানটা আর আমার এগুল না।

না এগুক, তারপর দিন আরও গুছিয়েই নিলাম ভালো করে। শেখাবার জন্যে বেশি ফাইলই রাখলাম আনিয়ে। তারপর যথাসময়ে, অর্থাৎ সুপর্ণা এসে যখন প্রবেশ করেছে ঘরে, আরম্ভ করেছে গোছানো, কাজ করতে করতে হঠাৎ একটু আড়ামোড়া ভাঙতে ভাঙতে বললাম—"একটু যেন কেমন কেমন বোধ হচ্ছে আজ, তুমি একটু বোস তো রজত, বাগান থেকে একটু ঘুরে এলে যদি মাথাটা ছেড়ে যায়···"

বারান্দা থেকে নেমে বললাম—"তুমি না হয় সুপর্ণাকে ফাইলগুলো ততক্ষণ চিনিয়ে দেবে—কাল যেমন বলছিলুম ?···সুপর্ণা, নাও না দেখে একটু। অবিশ্যি একদিনে হবে না··· তবু···"

সেদিন আগের দিনের চেয়ে যোগাযোগটাও ছিল আরও ভালো। কদিন থেকে মেঘলা আকাশ, মাঝে মাঝে বৃষ্টিও নামছে, সেদিন আমার বাগানের দিকে

হাওয়ার সঙ্গে আবার নামল বৃষ্টি। অবশ্য আর-একদিন যেমন হয়েছিল ততটা নয়, তবু বেশ খানিকটা আটকে গেলামই।

যখন ফিরলাম দেখি রজত ভেতর থেকে বারান্দায় এসে নির্বিকারভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে। খুব যে খুশী হলাম এমন নয়। প্ল্যান যে পণ্ড হয়েছে তার একটা নিদর্শন, অফিস-ঘরটা প্রায় যথাবৎ অগোছাল হয়ে পড়ে রয়েছে। এবং সুপর্ণাও নেই।

বললাম—"তাহলে তুমি এবার যাও; আর কাজ করব না এখন।....ইয়ে... ...সুপর্ণা একটু চিনল ফাইলগুলা? কেমন বুঝছ?" একটু উদ্দীপ্তই হয়ে উঠল রজত, বলল—"খুব ইন্‌টেলিজেন্ট্ স্যার; একবার দেখেই সবগুলা টপটপ চিনে ফেললে; মিনিট দশও লাগল না।"

মনে মনেই বললাম—"ইন্‌টেলিজেন্ট্ না তো কি সবাই তোমার মতন গর্দভ হবে? এক গাদা ফাইল এনে দিলাম তা দশটা মিনিটের বেশি আটকে রাখতে পারলে না?"

খাওয়ার সময় দয়া-মাসীমা আজকাল প্রায় রোজই এসে বসেন।...কিছু ঠিক করলাম কি ভেবে?...সুপর্ণা ওঁর মেয়ে ভালো, সেদিক দিয়ে দেখতে হবে না।... বিয়ে এতদিন হয় নি, সে তো মেয়ের দোষ নয়। খোঁজে কে, ব্যবস্থা করে কে? আর যার তার হাতে তুলে দেওয়াও তো যায় না, নৈলে সম্বন্ধ আসত বৈকি, মেয়ের রূপ আছে গুণ আছে, আর একেবারে যাকে বলে হাঘরে তাও তো নয়। বাপ নেই, কিন্তু ব্যবস্থা করে গেছে। একেবারে যে খালি হাতে শ্বশুরবাড়ি গিয়ে উঠবে এমন নয়।...আসত সম্বন্ধ, কিন্তু আবার ছেলেও নজরে লাগা চাই তো।

—বকে যান নিজের মনে।

একদিন জিজ্ঞাসা করলাম—"একজনও লাগে নি নজরে? কিছু বলে না?"

"আমাদের নজরেই কোন্ পড়ল বাবা, যে ওর পড়বে? ডাগরটি হয়েছে, এখন পছন্দ-অপছন্দ দাঁড়িয়েছে তো একটা।"

আমি হেঁট হয়ে খেতে খেতেই প্রশ্ন করলাম—"এখানে এসে হয় নি কাউকে পছন্দ?...বলে না কিছু?"

শেষের কথাটা বলতে গিয়ে মুখ তুলে দেখি দুজনে মুখ চাওয়াচাওয়ি হচ্ছে। দয়া-মাসীমা বললেন—"এখন পছন্দ হয়েছে বৈকি বাবা, আর পছন্দ না হয়ে পারে ?"

"বলেছে কিছু ? কদমকে তো বলতে পারে।"

কদম মুখটা একটু ঘুরিয়ে নিলে। মাসীমা একটু যেন ইতস্তত করলেন, তারপর আর একবার কদমের দিকে আড়চোখে চেয়ে নিয়ে বললেন—"মুখ ফুটে কো বলতে পারে না। তবে টের পাওয়া যায় তো। বরং যত চুপ করে থাকবে ততই তো স্পষ্ট হবে যে হয়েছে পছন্দ। যারা মাথার ওপর তারা এই করেই তো টের পায় বাবা। পছন্দর দিকে তুমি নিশ্চিন্দি থাকো।"

আমি হাত গুটিয়ে সোজা হয়ে বসলাম। বললাম—"সেইটে বিশেষ দরকারী কথা মাসীমা। বিয়ে অবশ্য দুরকমেই দেওয়া যায়। বয়স হয়েছে, এখন মেয়ের অত পছন্দ-অপছন্দর কথা না ভেবে দুহাত এক করে দেওয়া যায়, যেমন আবহমান কাল থেকে হয়ে আসছে। এক-একবার মনে হয় সেই ব্যবস্থাই করি। তবে, আবার ঐ বয়স হয়েছে বলেই, নিজের বিবেচনা হয়েছে বলেই মনে হয়, না, একেবারে সায়েবদের মতন না হোক, একটু যেন মন-জানাজানি হয়ে যাওয়া ভালো। যুগটাও পালটেছে তো।"

কদম মুখটা ঘুরিয়েই আছে, দয়া-মাসীমা মালা হাতেই বসেন এসে, আঙুলগুলা চলছে খুব দ্রুত গতিতে। বার দুইতিন কদমের পানে চাইলেন, যেন সাহায্য চান ওর। শেষকালে বললেন—"তা তুমি যেরকমভাবে করতে চাও ব্যবস্থা কর না বাবা, হাতের কাছেই তো রয়েছে।"

আবার কদমের পানে চেয়ে প্রশ্ন করলেন—"কি বলিস গো, তুই যে মুখ ঘুরিয়েই রইলি।"

কদম মুখটা ঘুরিয়ে এনে কারুর দিকেই না চেয়ে বলল—"তা বৈ কি।"

বাইরে গিয়ে ডিবে থেকে পানটা মুখে দিয়ে খেয়াল হল—একটা কথা জিগ্যেস করা হল না, মাসীমার নিজের কিরকম লাগে রজত ছেলেটিকে। শুধু দরকার নয়, উচিতও; এত কথা হল, তা উনি যেন একেবারে বাদ পড়ে গেলেন। খানিকটা উৎসাহ পেয়েছি বলেই একটুকু খুঁতও সত্ত সত্ত মিটিয়ে

নেওয়াই ঠিক মনে হল। ভেতরে পা দিয়েছি, কানে গেল মাসীমা কদমকে বলছেন—"হ্যাগা, এইরকম স্পষ্ট করে জিগ্যেস না করলে আমিই বা—"

আমায় দেখতে পেয়ে কদম চোখের একটু ইসারা করে দিতে থেমে গেলেন। ঘুরেও চাইলেন।

আমি এগিয়েই গেলাম; এই প্রসঙ্গই তো চলছে। ওঁর অসমাপ্ত কথাটুকুরই জের ধরে বললাম—"সে তো বুঝলামও মাসীমা, স্পষ্ট জানতে পেরে আমার সুবিধেও হল অনেকটা, তবে আপনার পছন্দ-অপছন্দর কথা তো জিগ্যেস করা হয় নি, সেটাও তো জানা দরকার।"

মাসীমার মনটা কদিন থেকেই খুব প্রসন্ন, কথাবার্তা রোজ এই ধরনেরই হচ্ছে তো। হেসে ঘাড়টা একটু উলটে দিলেন, কদমের দিকে চেয়ে বললেন—"শোন্ গো বাছা, কি বলে;—আমার নাকি অপছন্দ!"

বারো

এদিকে কিন্তু একই ভাব। খানিকটা আন্দাজ আরও পেতে আমি আর একটু উৎসাহের সঙ্গেই লাগলাম। যতটা সম্ভব সুযোগ করে দিচ্ছি মেলা-মেশার—একান্তে মেলা-মেশারও, কিন্তু ওদের সেই কঠিন ঔদাসীন্যের ওপর এতটুকুও যেন আঘাত হানতে পারছি না। তারপর একদিন বিষয়টা অনুধাবন করতে করতে আমার একটা কথা মনে উদয় হল, পূর্ব থেকেই প্রণয়-ঘটিত কোন ব্যাপার নেই তো! ওদের হাব-ভাব, গতিবিধি এই দিক দিয়েই লক্ষ্য করতে লাগলাম।

সুপর্ণার যে নেই এটা একরকম সন্দেহাতীত ভাবেই টের পেয়ে গেলাম, একটু লক্ষ্য করার পরই। প্রথম তো পাড়াগেঁয়ে মেয়েদের ওসব বালাই কমই থাকে, তার ওপর ওর যেরকম সদাপ্রফুল্লভাব, আর, সেটা এখানে এসে যেমন বেড়েছে এবং বেড়েই চলেছে তাতে মনে করবার কোন কারণই থাকতে পারে না যে ও সেখান থেকে কোনও সে-ধরনের স্মৃতি বহন করে এনেছে এখানে। ব্যাপারটাকে বরং অভিজ্ঞের বিচারের দিকে নিয়ে গেলে ঠিক উল্টো ধরনের একটা সন্দেহ জন্মায়

মনে। স্থপর্ণা স্থন্দরী, আর সবদিক দিয়েই বাঞ্ছনীয়া ; এখানে এসেছে পর্যন্ত ওর যে এই নিশ্চিন্ত প্রসন্নতা এতে কি তাহলে এইটিই দাঁড়ায় না যে কোন দিকে এমন কিছুর সূত্রপাত হয়েছিল সেখানে যা ওর পছন্দ ছিল না, বা আজকেরই কারণ হয়ে উঠে থাকবে, এখন এখানে এসে ও যেন সেদিক দিয়ে মুক্ত আর নিরাপদ বোধ করছে নিজেকে।

যতদূর সম্ভব অভিনিবিষ্ট হয়ে লক্ষ্য করছি এই অনুমানটা রঞ্জতের সম্বন্ধে যেন খাটে না। রঞ্জত আজকাল থাকে বড় অন্যমনস্ক এবং একটু অবসর পেলেই যেন বিষন্ন হয়ে পড়ে। কেন এমন ? ও কি ভালোবাসে কাউকে ?

শুধু বিষন্ন নয়। এক-একবার হঠাৎ দেখে ফেলাতে আমার এও মনে হয়েছে যে ও যেন আতঙ্কিত। আরও বিস্মিত হয়েছি।

তারপর চিন্তা করে করে কারণটা যা আন্দাজ করেছি তাতে ওর প্রতি সহানুভূতি আর করুণায় আমার মনটা দ্রবীভূত হয়ে উঠেছে।...রঞ্জত ভালোই বাসে। ওর মতো ছেলে যে ভালোবাসা পাবে—অনেক দিক থেকেই পাবে, এটা তো খুব সহজ, সরল সত্য ; এরই মধ্যে রঞ্জত কোনখানে প্রতিদান দিয়ে বসে আছে নিশ্চয়।

ওর আতঙ্ক এই যে ও স্থপর্ণার আকর্ষণের গতির মধ্যে চলে আসছে ; জোর করে টেনে আনা হচ্ছে ওকে। আমি টেনে আনছি ; ওর 'বস্', চাকরি-জীবনে ওর দণ্ডমুণ্ডের বিধাতা।

আমি আমার এই নিষ্ঠুর পরীক্ষা একেবারে বন্ধ করে দিলাম। নিজের স্বার্থে, তারচেয়ে ঢের বেশি নিজের শখে, নিজের লঘুচিত্ততায় আমি কী যে একটা সর্বনাশ ঘটাতে যাচ্ছিলাম অপরের জীবনে !

একেবারে ছেড়ে দিলাম ওদের। আমার জীবন আবার সহজ প্রবাহে ফিরে এল। দেখলাম পরের চর্চায় আত্মনিয়োগ করতে নিজেকে কি ভাবেই না বঞ্চিত করছিলাম। ফিরে এলাম আবার সবার মধ্যে। একদিকে ঠাকুর, রামকানাই, মালী, অন্যদিকে তাদের তিনজনের মোহাড়া নিতে কদম। সেদিন অমন ধমকটা খাওয়াতে ওরা তিনজনে বেশ একটু উল্লসিত, তাইতে কদমও খুব সতর্ক, খুঁত বের করছে ; নালিশ পৌঁছাচ্ছে, মিটিমিটি চলছে। খানিকটা পূর্বের জীবন ফিরে

এসেছে। তারপর দয়া-মাসীমা, স্বপর্ণা; দৈব-যোগে যাদের পাওয়া গেছে কিছুদিনের জন্য। কিছুদিনের জন্যই বৈকি, কি ভেবে এসেছেন, আবার কবে কি ভেবে হঠাৎ চলে যাবেন; পারব ধরে রাখতে?

এ বয়সে, জীবনের সায়ংকালে মা-মাসীর স্নেহ, এক হিসাবে প্রাপ্যই বলা যায় না, দৈবাৎ পেয়ে গেছি; আর এই নাতনীর সাহচর্য, বয়স হিসাবে সবচেয়ে যা বড় কাম্য।…বঞ্চিত করছিলাম নিজেকে।

কদিনে কাজেরও বেশ কিছু বাকি পড়ে গেছে; সেগুলা সামলাতে অফিসে বিলম্ব হয়ে যায়, সেইজন্য বাড়িতে যে সময়টুকু হাতে পাই আর অপচয় করি না, যতটা পারি ডেকে এনে কিম্বা ভেতরে গিয়ে এদের সাহচর্যে কাটিয়ে দিই।

কাটতেও লাগল ভালো; কিন্তু খুব বেশি দিন চালানো গেল না।

খাওয়ার সময়েই পুরো বৈঠকটা হয়। প্রসঙ্গক্রমে বলে নিই, আজকাল এই সময়টুকুই সারাদিনের মধ্যে আমার সবচেয়ে মনোজ্ঞ হয়ে উঠেছে। পাঠক-ঠাকুরের স্বেচ্ছাচারের যুগ—পোড়াডাল, ধরা ভাত, আলুনি বা নোন্তা ব্যঞ্জন, যা অভিরুচি সামনে ধরে দেবে, তাড়াতাড়ি নাকে মুখে গুঁজে আফিস ছুটব, সেটা কদম আসার সঙ্গে সঙ্গেই কেটে গিয়েছিল, বৈচিত্র্যের দিক দিয়েও যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। রসনার রসের সঙ্গে মনের রস মিলিয়ে এই সময়টুকু আমি আরও সার্থক করে তুললাম। বৈঠকটিতে এখন তিনজনেই থাকে। থাকতও অবশ্য তিনজনই, তবে প্রসঙ্গে-অপ্রসঙ্গে প্রায়ই এদিকে ওর বিবাহের কথাটা এসে পড়ত বলে স্বপর্ণা একরকম ছেড়েই দিয়েছিল বসা, এখন ওটুকু বাদ দিতে ও-ও আবার পাখাটা হাতে নিয়ে নিজের জায়গাটিতে কায়েমী হয়ে বসল। বাড়ির বাইরে থেকেও ওদিকে রজত বাদ পড়েছে বলে ও আমার সম্বন্ধে খানিকটা যেন নিশ্চিন্তও হয়েছে আজকাল; আমি যে চেষ্টা করেই দুজনকে দুদিক থেকে টেনে একত্র করছিলাম, এটা তো না টের পেয়েই পারে না। বেশ জমে ওঠে আমাদের আসর। ইচ্ছে করেই খাওয়ায় ঢিলে দিয়ে দয়া-মাসীর বাৎসল্য রস উদ্রেক করি, বকুনি খাই, মায়ের কথা টেনে আনি, মিথ্যা করেই রান্নার দোষ দেখিয়ে স্বপর্ণাকে চটাই, এক-একদিন কদমেরই কোন নূতন বা পুরানো অভিযোগের সূত্র ধরে রামকানাইকেও ডাকিয়ে পাঠাই, মৃদু কলহের

মধ্যে দিয়ে বৃদ্ধ-তরুণীর যে দাম্পত্য রসটি ফেনিয়ে ওঠে সেটাও কম উপভোগ্য হয় না।

বেশ চলল কদিন, তারপর একদিন মনে হল, নিজের রসেই মশগুল হয়ে রয়েছি বলে একটা জিনিস লক্ষ্য করা হয় নি, মনে হল দয়া-মাসীর যেন আর সেরকম আগ্রহ নেই। দুদিন ভালো করে লক্ষ্য করতে সন্দেহটা আরও স্পষ্ট হল—ভাবটা যেন, আমায় ক্ষুন্ন করলে চলবে না তাই এসে বসছেন, কিন্তু দিন দিনই যেন মনে মনে নিরাশ এবং ক্লান্ত হয়ে উঠছেন।

এর মধ্যে একদিন একটি ব্যাপার হয়ে গেল ; ছোট্ট কিন্তু বেশ কৌতুকাবহ। কদিন থেকেই বিকালবেলার আকাশটা বড় অনিশ্চিত থাকছিল বলে ঘর থেকে বেরুই নি, সেদিন পরিষ্কার দেখে একটু ঘুরে আসব মনে করছি, দেখি সুপর্ণা আর কদম ভেতর থেকে বেরিয়ে এল। সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাইতে সুপর্ণা বলল—"যাচ্ছিলাম আপনার বাগান দেখতে।"

বললাম—"বেশ তো, যাও···"

তারপরেই হঠাৎ কি মনে হল—বোধহয় বাগানে যাওয়ার কথা থেকেই এই কথাটা যে, পাড়গেঁয়ে মেয়ে অবরুদ্ধ হয়ে রয়েছে এখানে—

বললাম—"তার চেয়ে চলো না একটু আমার সঙ্গে বেরিয়ে আসবে।"

সুপর্ণা একটু বিস্মিত হয়েই বলল—"বাইরে বেড়াতে!"

বললাম—"দোষ কি?"

একটু ঠাট্টাও জুড়ে দিলাম—"আধুনিকা বলে শুধু মুখে আমাদের সেকেলেদের সঙ্গে তম্বি করলে চলবে না তো।···আধুনিক একজন এলে দরকারও পড়তে পারে এরপর।"

যেন পড়েছে একটু দোটানায়, তবে ঠাট্টাটুকুর জন্যেই একটু চিবুকটা বাড়িয়ে হেসে বলল—"যখন দরকার পড়বে, আধুনিকের সঙ্গেই বোঝাপড়া হবে।···চল্ কদম।"

বললাম—"অভ্যেসটা সেকেলের সঙ্গে আরম্ভ করলে সহজ হত।"

কদম মুখটা ঘুরিয়ে শুনছিল, বলল—"যাওয়ি না দিদিমণি না হয়, আমিও তাহলে ঠাকরুন-মার কাছে বসি একটু, ব্যথাটা একটু বেড়েছে বলছিলেন।"

সুপর্ণা বলল—"তা যা না, একলা কি যেতে পারি না বাগানে ?"

বললাম—"এটা অবশ্য আরও আধুনিকার মতন কথা হল…"

সুপর্ণা যেন একটু জ্বালাতন হয়ে উঠে বলল—"বাবা বাবাঃ! চলুন দাদু, কত আধুনিকা হতে পারি দেখুন…সামলান্।"

আমার পাশ দিয়ে গটগট করে এগিয়ে গিয়ে বারান্দা থেকে নেমে পড়ল। ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল—"কৈ নামুন, পেছিয়ে পড়লেন যে।"

আমার বাসাটা শহরের একদিকে। লোকের বসতি এখানটা অনেক কম হয়ে এসেছে, সামনে দিয়ে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তাটা চলে গেছে, সেটা পেরিয়েই টানা মাঠ। অনেক আগে সায়েবদের পোলো খেলার মাঠ ছিল। এখন শহরের দিকটায় ছেলেরা একটা ফুটবল গ্রাউণ্ড করেছে। বাকিটা প্রায় পরিত্যক্ত, যাদের বেড়াবার শখ একটু ঘোরাঘুরি করে।

গোটাকয়েক চক্কর দিয়ে একটু দেরি করেই ফিরলাম; প্রায় সন্ধ্যার কাছাকাছি। গেটটা বাসা থেকে বেশ খানিকটা দূরে, প্রবেশ করতেই নজরে পড়ল কদম আমার বারান্দার সিঁড়িতে পা নামিয়ে গালে হাত দিয়ে চুপ করে বসে আছে। ঘাড়টা অবশ্য একটু অন্যদিকে ঘোরানো, তবু বেশ বোঝা গেল, আমাদের আসার কথাটা যে টের পায় নি তা অত্যন্ত অন্যমনস্ক হয়ে রয়েছে বলেই। সুপর্ণা চুপি চুপি বললেও—"হঠাৎ শব্দ করে চমকিয়ে দোব দাদু?…আপনি না থাকলে ঠিক দিতুম কিন্তু।"

আর চুপ্পা এগুতেই কদম মুখ ঘুরিয়ে দেখেই ধড়মড়িয়ে উঠে পড়ল। বেশ একটু যেন থতমত খেয়ে গেছে। সুপর্ণা জিগ্যেস করল—"তুই এখানে বসে আছিস সেই থেকে ?"

একটু আমতা আমতা করেই উত্তর দিল—"না,…সেই থেকে কেন? এই এসে বসেছি…একলা পড়ে গেছি তো…"

ব্যাপারটুকু বিশেষ কিছু না হয়েও যেন কেমন একটু ঠেকল আমার। ও যা বলল সেটা বানানো, সম্পূর্ণ না হোক কতকটা তো নিশ্চয় হয়তো নেম-রক্ষা করে একটু মালিস-টালিস করে এসেছে দয়া-মাসীমার পায়ে, কিন্তু ও যে এখানে বসে আমাদের জন্য প্রতীক্ষা করছিল, আর, একটা তেমনি গভীর চিন্তা নিয়ে, তাতে

আর সন্দেহের কিছু নেই। যে কারণেই হোক, বেশ ভালো লাগল না। ও কি মনে করে—আজকে আমাদের এটা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে। তা যদি হয় তো, ঠাকুর-চাকর-মালীর মতো আস্তে আস্তে আমার ওপরেও বেশ গার্জেন হয়ে উঠছে তো! অনেক রাত পর্যন্ত মনটা বেশ খারাপ হয়ে রইল, এবং ওর চিন্তা করতে করতেই আর-একটা কথা মনে হল যা এর পূর্বে ভেবে দেখি নি। মিলিয়ে দেখলাম সুপর্ণার বিবাহের কথা যখনই উঠেছে কদম যেন বেশ অন্তরের সঙ্গে যোগ দিতে পারে নি। চতুর মেয়ে, আলোচনাপ্রসঙ্গে বা জিগ্যেস করলে মানানসই করেই দিয়েছে উত্তর, কিন্তু সে রাত্রের গভীরতর চিন্তায় এইটেই যেন বারবার মনে হতে লাগল—সেসব উত্তরের সঙ্গে ওর অন্তরের যোগ নেই, যা হতে চলেছে তা যেন ওর মনঃপূত নয়, তবে যেন উপায়ও খুঁজে পাচ্ছে না—কথায় সায় দিয়ে, কাষ্ঠ হাসি হেসে ঠাট বজায় রেখে যাচ্ছে।

একেবারেই এর মনের নাগাল পাচ্ছি না।

পরদিন বিকালে সুপর্ণা ভেতরে চলে যাওয়ার পরই কদম আবার সেদিনকার মতো দোরের কাছে আমার দৃষ্টির একটু আড়াল হয়ে দাঁড়াল।

জিগ্যেস করলাম—"কে?"

বলল—"আমি কদম বাবাঠাকুর।"

একটু সময় নিলাম, তারপর জিগ্যেস করলাম—"কিছু বলবি?"

আগের দিনের মতো আগ্রহ দেখিয়ে আর সামনে ডাকলাম না। কদম বলল—"ইয়ে, একটা কথা; ঠাকরুন-মা বলছিলেন···"

একটু চুপ করে গেল। বললাম—"কি বলছিলেন, বল্।"

'বলছিলেন সে তো বেশ একটু অভিমানের কথাই বাবাঠাকুর—ছেলেকে না হয় বল এবার আমাদের পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করুক···"

বললাম—"বাড়ির হাওয়া কি হয়েছে বল্ দিকিন?···সবার মুখেই 'ছেড়ে দাও, পাঠিয়ে দাও'···"

ওকেও টেনে বলা, কদম একটু লজ্জিতভাবে হেসে তাড়াতাড়ি বলল—"তা আমিও সেই কথা বললুম—কেন, যাওয়ার কি হয়েছে ঠাকরুন-মা এত তাড়াতাড়ি? আজকাল তো নিজের ছেলেও মাকে এমন মাথায় করে

রাখে না।···ভাঙবেন না, তারপর বেরিয়ে পড়ল কথাটা। আজকাল তো দিদিমণির বিয়ের কথাটা তেমন করে হয় না, তাইতে দুঃখু, অভিমান যাই বলুন।···আমি বললুম—সে কি কথা ঠাকরুন-মা, একটা ভার বাবাঠাকুর নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন, ভুলতে পারেন কি? মুখে কিছু বলছেন না তার হেতু কাজের চাপ পড়েছে, তা ভিন্ন একটা জিনিস যা ঠিক হয়ে রয়েছে তা নিয়ে রোজদিন বলবারই বা কি আছে। তবে দেখছি তো দিদিমণির ওপর···"

আমি বললাম—"ঠিক যা হয়েছিল সেটা আর টেঁকল না কদম। অনেক ভেবে দেখলাম···"

চমৎকার একটি অভিনয় করল কদম। ধরতে পারতাম না, তবে কাল রাত্রে ওর কথা চিন্তা করে করে একটা নাকি নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করেছি তাইতেই দেখলাম একটি অভিনয়ই করল।······যে ব্যবস্থাটা করেছিলাম সেটা যে টেঁকল না তাতে ও খুশীই ভেতরে ভেতরে, উল্লসিতই।······একটা অভিনয় করে মনের ভাবটা চাপ দেওয়ার চেষ্টা করল।

বললাম—"হ্যা, অনেক ভেবে দেখলুম। সব কথা সবাইকে বলা যায় না, তবে এ সম্বন্ধটা বাতিল করে দেওয়াই ঠিক করলুম। মাসীমা ঠিকই ধরেছেন, আবার একটা নজরে না এলে তো আলোচনা করে ফলও নেই সুপর্ণার বিয়ের কথা। তবে তুইও এমন কিছু ভুল বলিস নি। যখন আনিয়েছি, যখন বলেছি একটা ব্যবস্থা করব, তখন কি কথার খেলাপ হতে পারি বাছা? তবে সময় নেবে তো, তবু যত তাড়াতাড়ি হয় আমি চেষ্টা করছি, তুই বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাখিস একটু।"

আরও খানিকক্ষণ কথা হল। কিন্তু প্রায় একতরফা। কদম শুনে যেতে যেতে এক-একটা উত্তর মাঝে মাঝে দিয়ে যেতে লাগল বটে, তবে খুব অন্যমনস্ক, এক-একটা উত্তর যেন অসংগতও, মনে হল ওর কি যেন একটা বলবার ছিল কিন্তু কি করে আরম্ভ করতে হবে কোনমতেই ঠিক করে উঠতে পারল না শেষ পর্যন্ত।

পরদিন দয়া-মাসীমা খাওয়ার সময় এসে বসলেন না। ডেকেই বসাতাম, অমন কথাটার পর; কিন্তু আফিসের একটা নূতন সমস্যা উদয় হয়েছে—আমাদের সহ-ব্যবসায়ী ম্যাকিনন্ কোম্পানির সঙ্গে একটা বিষয় নিয়ে দারুণ মতান্তর শুরু

হয়েছে, তাই নিয়ে আমিও ছিলাম খুব অন্যমনস্ক, প্রায় কারুর সঙ্গেই কোনরকম কথা হল না সেদিন; একটা মৌন পরিবেশের মধ্যে তাড়াতাড়ি আহারটা কোনরকমে সেরে আফিসে বেরিয়ে গেলাম। ওদের একজন প্রতিনিধি আসবারও কথা ছিল।

কেউ এল না। টেলিফোনে খানিকটা যে অমীমাংসিত বার্তালাপ হল তাই নিয়ে সন্ধ্যার সময় মনে মনে আলোচনা করছিলাম, ঠিক সেইখানটিতে এসে কদম আবার ছায়া ফেলল। ঘুরে দেখে বললুম—"কিছু বলবি ?"

বলল—"ঠাকরুন-মা সমস্তদিন কান্নাকাটি করেছেন। অন্য কোথাও হয় তা ওঁর একেবারেই......"

মনটা ভালো ছিলই না, আমার মুখ দিয়ে কতকটা যেন আপনিই বেরিয়ে গেল—"তা তোর মতটা কি ?"

বেশ একটু হকচকিয়ে গেল, প্রশ্নটা করাও হয় নি তো বেশ মোলায়েম করে, বলল—"আমার মত......আপনারা দুজনে রয়েছেন......আর আমার মত তো কাল জানালুমও......"

"তা জানিয়েছিস বটে, ব্যবস্থাটা টেঁকল না শুনে চমকে উঠেছিলি।......বেশ, দেখি ভেবে।......কলকেটা বদলে দিয়ে যা দিকিন"—বলে সরিয়ে দিলাম।

খিঁচড়েই ছিল মনটা; রজতকেও জড়ালাম। পরদিন আফিসে গিয়ে ওকে ডেকে সব খুঁটিনাটি দিয়ে একটি ভালো পাত্রের জন্য বিজ্ঞাপন ডিক্‌টেট্ করলাম, বললাম—"ইংরাজী বাংলা পাঁচটা বড় বড় কাগজেই পাঠিয়ে দাও।"

আমার চেয়ারটা পেরুবার সময় মনে হল যেন একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। স্বস্তির নিশ্চয়, আমিও একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করলাম; যাক শেষ হল রজতকে নিয়ে এ-পর্বটা।

তেরো

নূতন পর্ব যা আরম্ভ হল—পাত্র বাছাইয়ের—সেটা আর কিছু না হোক, বেশ কৌতুকজনক। কত রকমের ফরমাস, নব-নব চরিত্রের সাক্ষাৎ পাওয়ার জন্য ডাকের প্রতীক্ষায় উৎসুক হয়ে থাকি।·····পাত্র স্বয়ং লিখছে—'কায়স্থ, অসবর্ণ বিবাহে আপত্তি নেই, এবং পাত্রীপক্ষ স্বীকৃত হলে পণের প্রশ্ন একেবারেই তুলে দেওয়া হবে।·····নূতন ব্যারিস্টার, বিবাহের পর "হনিমুন"টা বিলাতে গিয়ে সারতে চায়; আপত্তি আছে?······বিপত্নীক, তিনপুত্র, দুই কন্যা, সওদাগরি আফিসের বিভাগীয় বড়বাবু; পণ সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহ নেই।······সপত্নীক, দ্বিতীয় বিবাহ গোপনেই সম্পাদিত করতে ইচ্ছুক, পণপ্রথার সম্পূর্ণ বিরোধী।

আফিসের একঘেয়ে ফাইল ঘাঁটাঘাঁটি, ডিকটেশন, দস্তখতের মধ্যে একটা বেশ বৈচিত্র্য এনে দিয়েছে।

ফটোর ফরমাস—বসিয়ে, দাঁড় করিয়ে, খোলা চুলে, কবরীবন্ধ; একজন চেয়েছে এ-সবই, অতিরিক্ত একটি প্রফাইল, অর্থাৎ মুখের পাশের ছবি। প্রফাইলে মেয়ে হেলান দিয়ে থাকবে শোফায়। উমেদার আর্টিস্ট।

একেবারে উগ্রপন্থীদের অবশ্য উত্তর দেওয়া হয় না, তবে সুপর্ণার সঙ্গে হাস্যপরিহাসে বেশ কাজে লাগে। আমাদের ঘরের সঙ্গে মিলিয়ে বেশ ভালো ভালো পাত্রও আছে, নূতন পাশকরা ডাক্তার, নূতন উকিল, বাপের পুরনো পশার, ইনজিনিয়ার, চাকরিতে ঢুকেছে, উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ, মেয়ে খুব সুন্দরী হওয়া চাই, পছন্দ হলে পণে আটকাবে না।

এগুলোর আলোচনা হয় দয়া-মাসীমার সঙ্গে, যখন খেতে বসি। কদম তো আছেই।

জিনিসটা নিয়ে একটু বেশ উঠেপড়েই লেগেছি।

এ ফাইলটাও রেখেছি রজতের হাতেই। নিজের মনের নিরিখেই মানুষের মনের একটা দুর্বলতার সন্ধান পেলাম এই থেকে, এটা যেন একটা সাইড-প্রডক্ট বা গৌণ অথবা আকস্মিক আবিষ্কার আমার। নিজের মন

ঘেঁটে ভালো-মন্দ তথ্য খুঁজে বের করার একটা অভ্যাস আছে বলে লাগছে একটু অদ্ভুত।

রজতের হাতে এই যে ফাইলটা দেওয়া—সেই তালিকা করবে, দোষ, গুণ, চাহিদার একটা বিবরণী তৈয়ার করবে, ফটো পাঠাবে, এমন কি তোলাবারও ব্যবস্থা করবে—এর মধ্যে মেয়েলীভাষায় যাকে বলে 'কুচুটেপনা' নেই কি আমার? একটা হীন, জব্দ করার ভাব—যেন আক্রোশের বশেই। অথচ কেন?—বেচারীর মন অন্যত্র পড়ে আছে সন্দেহ করেই—বলতে গেলে একরকম নিশ্চিত হয়েই তো আমি ওকে অব্যাহতি দিয়েছি।

যাক, রজত কিন্তু বেশ চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে নিজেকে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ফাইল, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পত্রাচার, দরকার হলে প্রসন্ন মুখেই ফটোগ্রাফারকে ডাকিয়ে ফটো তোলাচ্ছে, নিজের মতামতও দিচ্ছে বেশ প্রসন্ন নির্লিপ্ততার সঙ্গে। সাবাসই দিতে হয় বৈকি; ও যেখানে নিজের মন দিয়ে বসে আছে সেখানে ও এতই খাঁটি! সুপর্ণার মতো মেয়ের সঙ্গে এতদিনের সাহচর্যে—না হয় শুধু পরিচয়ই বললাম—ওর মনে কি এতটুকুও দাগ পড়ে নি?

যদিও পড়ে থাকে, যদি আমার সন্দেহ অলীক হয়, যদি এমনই হয় যে এই কঠিন পরীক্ষা, এই দুশ্চর তপ ও হাসিমুখে বহন করে যাচ্ছে, তাহলে ওকে শতবার সাবাস।

সুপর্ণা আলোচনাগুলা কৌতুকের সঙ্গে মিশিয়ে গ্রহণ করছে। যেগুলা একটু উদ্ভট, সেগুলা নিয়ে ওর সঙ্গে তো সোজাসুজিই রঙ্গরস চলে আমার, যেগুলা সমীচীন এবং সম্ভাব্য সেগুলাও বেশ একটা হাস্য পরিহাসের মধ্যে দিয়েই নেয় ও। আর পারেই বা কি করতে? কদমকে বোঝা শক্ত। ঠিক সেরকম পাত্রর প্রসঙ্গ উঠলে বেশ উচ্ছ্বসিতই তো হয়ে উঠছে। তবে খুব সতর্ক থাকি বলে বুঝতে পারি ওর মন রয়েছে আলাদা। আর এই সন্দেহটা দিন দিনই বাড়ছে যে ও যেন আমায় কিছু একটা বলতে চায় অথচ সাহস এনে ফেলতে পারছে না।

তবে দয়া-মাসীমার মনের ভাবটার মধ্যে আবছায়ার কিছু নেই। একেবারে স্বচ্ছ সুস্পষ্ট।

যদিও সুস্পষ্ট যে করতে চান এমন নয়। বসেন, অল্প হাসেনও কদমের দিকে

চেয়ে, প্রশ্ন করার ভঙ্গিতে এক-একটা বেশ অনুমোদনও করেন—"কিরে, মন্দ কি ? ……আর কত ভালো হবে ?"……বাইরে বাইরে সব ঠিক, কিন্তু ভেতরে যে একটা প্রবল অমত রয়েছে, সেটুকু বুঝতে বাকি থাকে না।

তবুও চালিয়ে যাচ্ছি। পঁচাত্তর বছর বয়স হল, এক-এক সময় মনে হয় পুরো ভীমরতি, সুপর্ণা আমার চেয়ে ওঁর হাজার আপন হলেও ঠিক ওঁর মতের ওপর নির্ভর করে বসে থাকলে তো চলবে না। তার চেয়ে বড় কথা, উপায়ও তো নেই। ওঁর দৃষ্টি কোথায় আটকে আছে তা তো স্পষ্টই দেখছি—ভালো করেই তো বুঝি রঞ্জতের মতো ছেলের মায়া কাটানো কত কঠিন ; কিন্তু সেখানে আমি করি কি ? কত চেষ্টা করে, কতটা এগিয়ে তো আমায় শেষ পর্যন্ত পেছু হটতে হল।

ওঁদের মেয়েরও যদি সেরকম মনের ভাব দেখতাম তাহলেও হয়তো লেগেই থাকতাম আমি রঞ্জতের দিকটা না ভেবে ; অমন কত ভালোবাসাবাসি হচ্ছে জীবনে এই বয়সে, কোনটা মনে হয় খাঁটি, কোনটা দেখা যায় স্পষ্টই মোহ—তা খাঁটি হোক, মোহই হোক, আবার তো মিলিয়েও যাচ্ছে ; হয়তো করেই যেতাম চেষ্টা শেষ পর্যন্ত ; কিন্তু কই, এতটুকুও তো উৎসাহ পেলাম না।

চেষ্টাটা তাই এই পথেই করে যাচ্ছি। সুপর্ণাটাকে সত্যই বড় ভালো লাগে, সাধ্যমতো ওর ভবিষ্যৎটা উজ্জ্বল করেই তুলব। তাইতেই ওর প্রতি আমার কর্তব্যের শেষ, মাসীমার প্রতিও, এবং তাঁর প্রতিও যিনি তাঁর নিজের বিধানে কোথা থেকে কাকে কাকে না একত্রিত করে স্নেহ-প্রীতির বন্ধনে বেঁধে ফেলেন, একেবারেই নিঃসম্পর্ক এই দায়িত্বের করেন সৃষ্টি। বেশ ভালোভাবেই সময় নিলাম—প্রায় একমাস, তারপর একশত তেত্রিশটি পাত্রের তালিকা থেকে একটি মাত্র বেছে নিয়ে মনস্থির করে ফেললাম।

ছেলেটি ইনজিনিয়ার, গবর্নমেণ্টে নূতন কাজ পেয়েছে ; উন্নতির পথ পরিষ্কার, বয়স ছাব্বিশ, রূপে আহা-মরি না হোক সুশ্রী, স্বাস্থ্য ভালো।

অবস্থাতেও কুলাবে। অবশ্য মাসীমার হাতে যা আছে তাতে নয়, তবে আমিও প্রস্তুত আছি বেশ খানিকটা পর্যন্ত।…মায়ের বাল্য-সখীর বড় বোন বড়-মাসীমা। তা ভিন্ন সুপর্ণাই বা কম কি ? ওকে পাত্রস্থ করব, আনন্দে-বেদনায়

এখন থেকেই মনটা টনটন করছে। একদিন নিজেদের মেয়েদের পর করে দেওয়ার সময় যেমন হয়েছে, নিজেদের নাতনীদের বেলায় তেমন হবে।

বিকালে আফিসে বসেই নির্বাচনের কাজটা শেষ করলাম। সেদিন আর কাউকে কিছু বললাম না, গুটি তিনেক ছেলে যে শেষে এসে দাঁড়িয়েছে তাদের নিয়ে মনের নিক্তিতে তৌল করে গেলাম—তা বেশ খানিকটা রাত জেগেই। একটিতে দাঁড় করালাম, তারপর দিনে খাওয়ার সময় সবার সামনে প্রকাশ করলাম, মাসীমা, কদম, ওদিকে অলক্ষ্যে রয়েছে সুপর্ণা নিজে।

সফলতার আনন্দে পাচক ঠাকুরকেও দলে টানলাম, বললাম—"এইরকম সম্বন্ধ ঠিক করছি তোমাদের দিদিমণির, কেমন মনে হয়?"

বললে—"এ তো রাজ-চটক হতে চলেছে একেবারে।"

দয়া-মাসীমাও অনুমোদনই করলেন—একটু ম্লান হেসে পাশে কদমের দিকে মুখটা ফিরিয়ে বললেন—"কি গো, তা মন্দ কি?"

কদম খানিকটা সামলে নিল, বলল—"তা বৈকি; এর চেয়ে আর ভালো কি হবে?"

সুপর্ণা কদমের কাছে বলেছে—ভালোই তো। মুখ ফুটে আর এর বেশি কি বলবে? রজতের সঙ্গে ভালো বা মন্দর অত সম্পর্ক নেই। যখন নির্বাচনটা হয়ে গেল স্বস্তির নিঃশ্বাসটা পড়ল আর-একবার, ওর যেন একটা ফাঁড়া কেটে গেছে বেশ ঘেঁসেই। কদম সেইদিনই সন্ধ্যার সময় আবার তার নিজের জায়গাটিতে এসে দাঁড়াল।

আমিও বারান্দাতেই বসে ছিলাম। ঘাড় ফিরিয়ে বললাম—"কদম দেখছি যে, কিছু বলবি বোধ হয়? পাত্রটি কি রকম মনে হচ্ছে?"

একটু সহজ হল ওর পক্ষে, বলল—"সেই কথাই তো বলতে এসেছি। ঠাকরুন-মা বলছিলেন—পাত্র তো বাছা হয়ে গেল কদম, এখন বিয়ে, তা সে তো আজই হচ্ছে না, আর যখন হবে তখন প্রতাপপুর থেকেও তো হতে পারবে, তাই বলছি তাহলে এখানে আর মিছিমিছি বসে না থেকে…"

"ফিরে যাই সেখানে, এই তো?"

আমার সেই জিদটা ধরে বসল, এই ভীমরতিগ্রস্ত বৃদ্ধার খেয়াল-খুশির

সামনে মেয়েটাকে বলি দেওয়া কোনমতেই চলবে না। ওটুকু মন্তব্য করে আমি ভালো করে ঘুরেই বসলাম, বললাম—"তাহলে শোন্ কদম, তুইও যেন এর মধ্যে আছিস। ভেতরকার কথাটা খুলে বল দিকিন। কোথায় বোঝাবি না আরও যেন সুরে সুর মেলাচ্ছিস। তাহলে কি তোরা চাস একটা পাড়াগেঁয়ে ম্যালেরিয়া রুগীর হাতে তুলে দেওয়া হয় মেয়েটাকে। বেশ, তাহলে তাই কর, আমি আর এর মধ্যে নেই।"

কদম একটু বেশ ভয় পেয়ে গেল, হয়তো ভেবেছিল আমাকে যেমন চালিয়ে নিয়ে এসেছে এ-ক্ষেত্রেও সেই রকম নিয়ে যাবে। আমতা আমতা করে বলল—"আমি তো বোঝাতে কসুর করি নি বাবাঠাকুর, যা দিব্যি করিয়ে নেবেন। ওঁর আসলে আপত্তিটা কোনখানে বলি ?…"

একটু থেমে গেল। বললাম—"বল্ না ; তাহলে তো বুঝি কতকটা। এ যেন ধাঁধায় ফেলে রেখেছিস সবাই মিলে।"

একটু চুপ করে ভাবল, কি বলবে যেন গুছিয়ে নিল মনে মনে, তারপর বলল—"আপত্তিটা হচ্ছে—ওঁর কথাতেই বলি…বলছিলেন—এ যেমন হচ্ছিল, সব জানা শোনা—উনিও তো থেকে যাবেন বলেই এসেছিলেন—মায়ের মতন আদর-যত্নেই রয়েছেন, কাছে দু-দুটো তীর্থ,—থেকে যাবেন বলেই এসেছিলেন—এখন যেমন ঠিক হয়েছিল—যেমন নাকি আপনি আগে ঠিক করেছিলেন—যদি এইখানেই বিয়েটা হয়ে যেত—দিদিমণি চোখের সামনে থাকত…সংসারে মায়ের বাঁধন এখন ঐ একটি তো…"

গুছিয়ে বলে উঠতে পারছে না, বললাম—"সে হবার নয়, কোনমতেই হবার নয়—তোদের চেয়ে আমার নিজের ইচ্ছে কম ছিল না ; কিন্তু বিস্তর বাধা আছে। সব কথা তো তোদের মুখ ফুটে বলা যায় না…"

একঠায় আমার মুখের দিকে চেয়ে শুনছিল, একটা যে দৃঢ়তার ছাপ দেখেছে তাতে নিশ্চয় আবার একটু ভয় পেয়েও গেছে, বলল—"তাহলে যেমন বললেন—আবার বুঝিয়ে বলব। শুনবেন নিশ্চয়—হবে শুনতে, না শুনলে চলবে কেন ? তাহলে একটা পরামর্শের কথা বলি বাবাঠাকুর—যদি ভরসা দেন।"

নরম হয়ে এসেছি, বললাম—"বল্ না।…পরামর্শ তো ভালই দিস এক-এক

সময়, তবে এখানি যেন মাসীমার খপ্পরে পড়ে গেছিস। ওঁকে যেন বাহাত্তুরে ধরেছে, তোকেও ছোঁয়াচ লাগল নাকি ?"

ওরও ভয়ের ভাবটা কেটে এসেছে। একটু হাসল, তারপর বলল "আমি বলছিলাম—উনি যেমন বলছেন—যাওয়ার আগে একবার ত্রিবেণী আর তারকেশ্বরটা সেরে যাবেন, সেই ব্যবস্থাই না হয় একবার করে দেবেন ? তাহলে বোঝাবার সময় পাই হাতে খানিকটা। আর তির্থি করতে গেলে মনটাও খানিকটা অন্যমনস্ক থাকে তো—এ যেন খালি মেয়ে—মেয়ে—মেয়ে……যা চাইছিলাম তা হল না—সব যেন ভেস্তে গেল…"

বললাম—"হ্যাঁ, এ বরং সুবিবেচনার কথা একটা। তাহলে কে কে যাবি ?"

যাওয়ার হুজুগ উঠতে কেউই বাদ গেল না শেষ পর্যন্ত। দয়া-মাসী, সুপর্ণা, কদম। বেটাছেলে সঙ্গে যাবে রামকানাই।

পরদিনই আমায় খাইয়ে দাইয়ে রওয়ানা হওয়া ঠিক হল।

আফিস যাওয়ার আগে গড়গড়াটা টেনে নিচ্ছি, রামকানাই এসে কাঁচুমাচু হয়ে বলল—"ঠাকুর বলছিল—পাপের শরীল…"

বললাম—"অস্বীকার করছে কে ?…গাঁজাটা ছেড়ে দিতে বলিস।…"

বলল—"সেই কথাই বলছিল—একবার তিরপুণীতে ডুব দিয়ে যদি দেহটা শুদ্ধ করতে আসতে পারি…তারপর আর ওসব নয়…" ঠাকুরেরও যাওয়া ঠিক হয়ে গেল।

বললাম—"তাহলে রজতকে বলে আয় কাগজপত্র যা আছে সব দেখেশুনে এখানেই নিয়ে আসবে। বাড়িতেই কাজ করব।"

খানিক পরে একগাদা ফাইল নিয়ে রজত এসে খবর দিল কলকাতা থেকে ম্যাকিননের সেই প্রতিনিধি সায়েবটা এসে উপস্থিত হয়েছে। অপেক্ষা করছে আমার আফিসে। ডাকিয়ে পাঠাব, কি, নিজেই যাব ?

যেতেই হল আমায়। সেই যে ওদের সঙ্গে মতানৈক্য নিয়ে লেখালেখি চলছিল, তাই নিয়ে এসেছে। ট্রাঙ্ক কলে হেড আফিসের সঙ্গে বোধ হয় কথাবার্তাও চালাতে হতে পারে।

রজত প্রশ্ন করল—সেও আসবে কি সঙ্গে ?

বললাম—"না, তুমি থাকো। এরা সব এখুনি বেরিয়ে যাচ্ছে, ঠাকুর সুদ্ধ; বাড়িটা খালি থাকবে। তুমি নোট-টোটগুলো ঠিক করো বসে বসে ততক্ষণ।"

চৌদ্দ

জীবনে অনেকবারই দেখলাম, একটা অপ্রত্যাশিত তেমন কিছু হবার মুখে কোথা থেকে কি করে অনেকগুলো ব্যাপার একত্র হয়ে যেন আসরটা তোয়ের করে ফেলে। ওরা সব বাড়ি খালি করে ত্রিবেণী চলে যাবে, আমি রজতকে ডেকে পাঠাব, হঠাৎ দিন বুঝে ম্যাকিননের লোক এসে বসে থাকবে, খালি বাড়ি বলেই বসিয়ে রেখে যাব, সায়েবের সঙ্গে মীমাংসায় পৌছাতে কলকাতায় হেড আফিসে ট্রাঙ্ক্ কল্ বুক করতে হবে, কনেক্‌শন্ পেতে অত্যধিক বিলম্ব হয়ে যাবে, যাতে বেশ খানিকক্ষণ আটকে যাব আফিসে…

এর ওপর স্বপর্ণার যদি সত্যই হঠাৎ মাথা ধরে থাকে তো অদ্ভুত যোগাযোগের কাণ্ড বৈকি।

বেশ খানিকটা দেরি হয়ে গেল আমার। গেটে প্রবেশ করতে যাব, দেখি মালী জটাধারী উৎকণ্ঠিতভাবে প্রতীক্ষা করছে, চোখ দুটো কপালে ঠেলে উঠেছে, খাড়টা এসেছে এগিয়ে, হাঁপাতে হাঁপাতে বললে—"হুজুর বিশ্বাস করেন না, মনে করেন মালী-বেটা বানিয়ে বলছে—দেখবেন চলুন—এখনও রয়েছে, এইমাত্র আবার দেখে আসছি…দুজনে বসে আছে যেন…যেন—সে কী যে বলব!"

ভাবগতিক দেখেই একটা কথা মনে হয়েছে, শুধু বুঝতে পারছি না তা কি করে সম্ভব হবে; তবু প্রশ্ন করলাম—"কদম?" "আর কে বলুন? আর কে ওপরে ওপরে অত সতী-সাধ্বী সেজে…"

গাটা যেন ঘিন-ঘিন করে উঠল। একটু চিন্তা করে নিয়ে বললাম—"আমি আফিসেই ফিরে যাচ্ছি, তুই রজতকে বলগে কাগজপত্র নিয়ে সেখানেই আসতে।"

তারপর আবার কি মনে হল—বোধ হয় নিজের ওপর অবিশ্বাস, স্বচক্ষে না দেখলে আবার হয়তো স্নেহের দুর্বলতায় সেবারকার মতো উড়িয়ে দেব ব্যাপারটা,—বাসার দিকেই পা বাড়ালাম, বললাম—"বেশ, তুই এখানেই থাক; দেখছি।"

হতভাগাটা এবারেও ভুল করেছে। নীলাম্বরী নেই অবশ্য, তবে মাথায় তো আক্রোশের সঙ্গে একটা বদ্ধ ধারণাই জেঁকে বসে আছে।

আমি অবশ্য পা টিপে টিপে যাই নি—দুজনে কী ভাবে বসে আছে সেটা প্রত্যক্ষ করবার মোটেই প্রবৃত্তি ছিল না—তবে একেবারে মুখোমুখি হওয়ারও প্রবৃত্তি না থাকায় বাড়ির মধ্যে দিয়েই গেলাম। পায়ের শব্দ নিশ্চয় হয়েছে, কিন্তু সতর্ক করতে পারে নি। কদম মোটেই নয়; রজতের পাশে ইজিচেয়ারের চওড়া হাতলের ওপর মাথা নীচু করে বসে আছে সুপর্ণা, আমি ঘরের চৌকাঠ ডিঙোতে ঘুরে দেখে উঠে দাঁড়াল।

ভাগ্যিস চোরের মতো প্রবেশ করি নি, বেশ সহজ উৎকণ্ঠার স্বরেই প্রশ্ন করতে পারলাম—"তুমি গেলে না সুপর্ণা! শরীর খারাপ হয় নি তো?"

যা দেখে ফেললাম সেটা যেন কিছুই নয়।

তাইতে সুপর্ণাও বেশ সহজভাবেই উত্তরটা দিতে পারল—"বেরুব, হঠাৎ এমন মাথাটা ধরে উঠল!"

আমার মনে হয় নাতনীরা দাদুদের এসব ব্যাপারে ততটা আমলও দেয় না।...বয়ে গেছে দেখে ফেলেছে তো!

বোধহয় আলাপটা এইভাবে বেশ ঋজু পথে চলায় রজতেরও জড়তা বা সঙ্কোচটা কেটে গেল, বলল—"শুনে, আমি বললাম—তাহলে আসুন বরং ফাইল-গুলো আস্তে আস্তে চিনিয়ে দিই।"

এত দক্ষ হয় নি তো এখনও, তাহলে খানকতক ফাইল কাছে এনে রাখত। আমি বললাম—"এটা বেশ বুদ্ধিমানের কাজ করেছ, অন্যমনস্ক থাকলে মাথাটা ছেড়ে যাবে খন।"

আরও একটা ভুল করে যাচ্ছে তখনও; চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় নি। আমার উত্তরটা পেয়ে এ ভুলটা শুধরে উঠে পড়ল বটে, কিন্তু আর-একটা মারাত্মক ভুল করে বসল।... উঠে দাঁড়াতেই কোলের কাছ থেকে ঝুরঝুর করে কয়েক-খানি ক্যাবিনেট সাইজের ফটো উলটপালট হয়ে নীচে ছড়িয়ে পড়ল। দেখলাম সেই বিজ্ঞাপনের উত্তরে যেগুলি তোলা হয়েছিল তারই এক-একখানি কপি।

একটু তো জড়িমা আসবেই; তবু বেশ সামলে নিল রজত, হেঁট হয়ে কুড়িয়ে

নিয়ে স্বপর্ণার দিকে বাড়িয়ে ধরে বলল—"বাঃ, এগুলো···কি করে এল এখানে স্বপর্ণাদেবী !···দেখছি তো আপনারই···"

একখানা তখনও পড়ে চেয়ারের নীচে, আমি খুঁটে নিয়ে লেখাটা নিজের মনে হলেও একটু স্পষ্ট করেই পড়লাম—"একান্ত তোমারই।"

বোধ হয় শেষ রক্ষা করতে পারলাম না। আমার অধস্তন কর্মচারী, একেবারে পাশেরই—উচিত ছিল বৈকি এটা মনে থাকা।

সেদিন সন্ধ্যার পর সবাই ত্রিবেণী থেকে ফিরলে জানিয়ে দিলাম—মতটা আবার বদলেছি ; ভেবে দেখলাম বিজ্ঞাপন দিয়ে চিঠিপত্রে অত বোঝা তো যায় না, কি রকম ঘর, কি বৃত্তান্ত ; আর গিয়ে খোঁজখবর নেব তার ফুরসতও নেই তো, সুতরাং আগেকার ব্যবস্থাটাই বহাল থাক্।

দয়া-মাসীমার মুখটা হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল, মাথায় দুহাত চেপে আশীর্বাদ বোঝাই করে কদমের দিকে চেয়ে বললেন—"দেখ্, তোরা আজকালকার মেয়ে, তিথি-ধর্ম বিশ্বাস তো করিস না—আমি গুনে গুনে শুধু ঐ কামনা করে পাঁচটা ডুব দিয়েছি। হাতে হাতে ফল দিয়ে দিলেন মা···"

স্বপর্ণা কথার সূত্রপাতেই সরে পড়ে পাশের ঘরে ঢুকেছে। আমি ফিরে আসতে আসতে ওর কানই লক্ষ্য করে বললাম—"নাঃ, আজকালকার মেয়েরা আর ডুব গালায় কৈ বিশ্বাস করে !"

বাড়ির সেই সহজ হাওয়াটা অনেকটা ফিরে এল। কদম অবশ্য সেই অভিনয়ই করছে। কিন্তু সফল অভিনয় ; শুধু আমিই জানছি, সুতরাং বাইরে বাইরে ঠিকই আছে। আমি জানছি—ও যেন বুদ্ধি করে সামলে নিয়ে এসে নিজের যে অভিপ্রেত তার দিকেই চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল ঘটনার স্রোত, আবার বড় একটা ধাক্কা খেল।

দয়া-মাসীমাকে খবর দিতে হয় না, যেন ঘরে জপ করতে করতে লক্ষ্যই করতে থাকেন, আমি চাঁইয়ে এসে বসলেই মালাটি হাতে করে এসে উপস্থিত হন। স্বপর্ণা মোটেই আসে না এ আসরে ! ধরা পড়ে যাওয়ার পর সে যেন এক ধরনের নিশ্চিন্ত হয়ে গেছে ; নিভৃতি খোঁজে, বেশ বুঝি স্বপ্ন রচনা করবার জন্যই ; কী স্বপ্ন রচনা করে সেই জানে।

কিন্তু রজতের হল কি ?

সাতদিনের ছুটি নিয়ে বসে আছে একেবারে! অসুখের অজুহাতে নয়; তাহলে জানে আমি গিয়ে উপস্থিত হব ; হয়েছি এর আগে। লিখেছে বিশেষ জরুরী কাজে সপ্তাহখানেকের ছুটি দরকার। অবশ্য কী যে হয়েছে—নিজেকে ঐ অবস্থায় কল্পনা করে নিতে বেশ সহজেই সেটা আন্দাজ করা গেল।

ওর সম্বন্ধে একটা কথা এদিকে কিছুদিন থেকে ভাবছিলামই ; কাজের চাপে, আবার যখন সেটা থাকত না, গড়িমসির জন্যই কিছু করে ওঠা হয় নি। হেড অফিসের সঙ্গে টেলিফোন করেই তাড়াতাড়ি অর্ডারটা আনিয়ে নিলাম। ছুটির যখন চারদিন হয়ে গেছে, ওকে বাড়িতেই ডাকিয়ে পাঠিয়ে অর্ডারটা হাতে দিয়ে বললাম—"রেকমেণ্ড করা ছিল, এতদিনে স্যাংকশন করেছে এই পনেরটা টাকা। বেশি নয়, তবে এর পরের চান্সেই তুমি একটা ভালো ডিপার্টমেণ্টে গিয়ে বসতে পারবে ; তারপর আমি তো রয়েছিই।"

এত ভালো লাগে এই বয়সের ছেলেদের নিয়ে নাড়াচাড়া করতে ; বিশেষ করে এই ধরনের! শুধু তো ভয় ভাঙানোই নয়, খুশী হয়েছি তার সুস্পষ্ট, নিঃসন্দিগ্ধ প্রমাণ। রজত মুখ তুলে চোখ নামিয়ে আমার কথাগুলো শুনছিল, একটু থমকে গিয়েই পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে উঠে দাঁড়াল। বলল—"আপনি যখন রয়েছেন স্যার···কৈ, আমি তো কখনও দরখাস্ত করেছি বলেও মনে "পড়ছে না···"

অভিভূত হয়ে পড়েছে, আর শেষ করতে না পেরে মুখখানা রাঙা করে দাঁড়িয়ে রইল।

বললাম—"কাজ ঠিক করে গেলেই হল, দরখাস্ত যে করতেই হবে তার মানে কি ?···হ্যাঁ, তোমার কাজটা হয়ে গেছে, না, আরও ছুটি নিতে হবে ? আমি বলছিলাম—এই সময়, একটা লিফ্‌ট্‌ দিলে কোম্পানি, অফিস থেকে অ্যাবসেণ্ট না থাকলেই যেন ভালো।"

বলল—"না, সেটা সেরে নিয়েছি। আজই জয়েন করব ভেবেছিলাম—আবার যাতে ছুটি না নিতে হয় তার জন্যে দুদিন বাড়িয়েই নিয়ে রেখেছিলাম কিনা।"

বললাম—"তাহলে কালই জয়েন করছ ? সে মন্দ নয়, দুদিন ছুটি হাতে থাকতেই জয়েন করা···আবার ঠিক লিফ্‌ট্‌ যখন পেলে···বেশ, এসো।"

ঘুরে পা বাড়াতেই আবার বললাম—"হ্যাঁ, ভালো কথা। তোমার সঙ্গে একটা পরামর্শ আছে, অন্য ব্যাপার নিয়ে, কাল সকালে একবার আসতে পারবে?"

বলল—"খুব পারব স্যার, বললাম তো ফ্রী হয়ে গেছি।"

বললাম—"তাহলে এসো একবার।"

নিশ্চয় কদম নয়, সুপর্ণাই। ঘরে এসে দাঁড়িয়েছিল, অত সাবধান হতে পারে নি, তাড়াতাড়ি ফিরে যেতে গিয়ে কপাটে একটা ধাক্কা লাগল।

পরদিন সকালে ওর জন্য একটা চেয়ার পাশে রাখিয়ে প্রস্তুত হয়েই অপেক্ষা করছিলাম, এলে বসতে বলে খুব চিন্তিতভাবে গড়গড়াটা খানিকক্ষণ টেনে গেলাম, তারপর বললাম—"একটা মুশকিলে পড়া গেছে রজত। কথাটা হচ্ছে সুপর্ণার বিবাহ নিয়ে..."

মুশকিলে পড়লে থেমে থেমে অল্প অল্প করে কথাটা বললে বেমানান হয় না। এই সুযোগে ওর মুখের দিকে একবার চেয়ে নিলাম। লাল হয়ে নুয়ে পড়েছে, কপালে একটু বোধ হয় ঘামও জমে উঠল।...কিন্তু এটা আমার একটু খেলা। লিখি, আর এ তো জ্যান্ত রোমান্স চালাচ্ছি একটা। তবে আর বেশি লজ্জায় না ফেলে আসল কথায় এসে পড়লাম। বললাম—"বিয়ের কথা মানে—তুমিই তো সমস্ত ফাইলটা ঘাঁটলে-ঘুঁটলে,—এমন কি বাছাইটাও একরকম তোমারই; তা ও ধরনের শিক্ষিত ছেলে আজকাল ওরা কি চায় জানই তো। শুধু দেখতে ডিসেন্ট হলেই চলে না, চায় একটু শিক্ষা, একটু বুদ্ধির দীপ্তি আর স্মার্টনেস্, শিক্ষা না হলে যা নাকি সম্ভব নয়...সেই হয়েছে মুশকিল..."

একটু চুপ করলাম, রজত আমার মুখের পানে একবার চোখ তুলেই আবার নামিয়ে নিল। বলে চললাম—"তা সেটা তো নেই সুপর্ণার। আগাগোড়াই পাড়াগাঁয়ে কাটল, সেখানে সম্বলের মধ্যে একটা মিড্‌ল্ স্কুল, তাও মেয়েদের নয়, ছেলেদের সঙ্গে মেলামেশা পছন্দ নয় বলে ওর বাপ-মায়ে প্রাইমারি স্টেজেই ছাড়িয়ে নেয়, তারপর দয়া-মাসীমা আবার স্কুলে পাঠাবার কত স্বপক্ষে সে তো বুঝতেই পাচ্ছ।...এই অবস্থা। পত্রাচার যা হয়েছে সে তো তোমার হাত দিয়েই হয়েছে। জানই প্রাইভেটে ম্যাট্রিক লক্ষ্য করে পড়ছে বলে চালিয়েছি; কিন্তু লক্ষ্য যে কত যোজন দূর তা তো তুমি জানই..."

জড়তা কেটে আসছে, বলল—"কিন্তু বেশ শর্প মেয়ে স্যার···"

অসাবধানে বলে ফেলেছে, আমিই সামলে দিলাম, বললাম—"সে তো তুমি বললেই সেদিন—ফাইলগুলো টকটক করে কিরকম দশ মিনিটে চিনে নিলে। আমি নিজেও তো দেখছি, এক হিসেবে বলতে গেলে সেই ভরসাতেই তো চিঠিপত্র ঐভাবে দিলাম—অনেকটা ভাঁওতাও তো। এখন মুশকিল হয়েছে সামলানো যায় কি করে। ম্যাট্রিকুলেশনের রাস্তায়ও তুলে দিতে একটা লোকের দরকার তো!···"

বলল—"আমার হাতে ভালো লোক আছে স্যার···"

বললাম—"ভালো লোক· কথাটা কি জানো···ইয়ং ম্যান্ আমি চাই না। মেয়ের বয়স হয়েছে, তোমার গিয়ে, একটু রিস্কি। বলবে বয়স্ক লোক দিতে পার। দেখেছি বড় লেজি, বড় ফাঁকিবাজ হয়। কাগজ পড়েই সময় কাটিয়ে দেবে।·· কথাটা হচ্ছে দুরকমই রাখা যায়, এ দুরকম ভিন্ন পাবই বা কোথায় আর—তবে যদি আমার জানাশোনা হয়।"

খুব কাছিয়ে নিয়ে এসে একটু সুতো ঢিলে দিলাম। দুদিকের নিস্তব্ধতার মাঝখানে শুধু গড়গড়ার ভুড়ুক ভুড়ুক শব্দ হচ্ছে। তারপর হঠাৎ মুখটা সরিয়ে নিয়ে প্রশ্ন করলাম—"তুমি এ দায়িত্বটুকু নিতে পার না?"

একটু চমকে উঠবে বৈকি, তবে আর সময় না দিয়ে বলে চললাম—"আর কিছু নয়, তাহলে আমি একটু নিশ্চিন্দি থাকি। এ হল ওদিককার কথা, যা নিয়ে বাইরের কোন ইয়ংম্যানে আমার আপত্তি। তারপর আফিসে, বাড়িতে সর্বদাই কাছে কাছে রয়েছ, দিনের দিন রিপোর্টটা পেয়ে যাই। তারপর দুজনে পরামর্শ করে যেমন যেমন দরকার পদ্ধতিটাও রদবদল করতে পারি, একেবারে কোথায় মিড্‌লও নয়, তাকে ম্যাট্রিকে টেনে তোলা! বুঝতেই তো পাচ্ছ।"

আবার একটু চুপচাপ, তারপর বললাম—"অবশ্য তুমি গ্র্যাজুয়েট অথচ আমার হয় তো একজন এক্‌স্‌পিরিয়েন্সড্ ম্যাট্রিকুলেট শিক্ষক হলেই চলে যায়, তবে যখন বুঝছি তুমি এলে সব দিক দিয়েই ভালো হয় তখন একজন গ্র্যাজুয়েটের বা কী তাই পাবে। দেখছি তো তোমার সময়···"

ইচ্ছা করেই এটুকু জুড়ে দিলাম যাতে একটু কথা বলবার সুযোগ পায় রজত ঃ

কীয়ের কথাতেই আবার চকিত হয়ে মুখটা তুলল, ব্যস্তসমস্ত হয়ে বলে উঠল—“একি বলছেন স্যার আপনি! ফী-এর কথা তুলে যে লজ্জা দিচ্ছেন। এর মধ্যে ফী-এর কথা এনে ফেললে কি করে এগুই আমি বলুন।”

হেসে বললাম—“আচ্ছা, সে দেখা যাবে তখন।”

টাকার কথা হলেও বিশেষ মূল্য নেই কথাটার। এইখানেই যবনিকা টেনে দিলাম আপাতত।

পনেরো

দয়া-মাসীমাকে বললাম ব্যবস্থাটার কথা। শুনে বেশ খুশীই হলেন, বললেন—“সে তোমাদের মনের মতন করে, আজকাল যেমন সেইরকম করে গড়ে পিঠে তোল না বাবা, আমার আর এতে বলবার কি আছে? বরং আরও আহ্লাদের কথা। ওর বাবা ছিল শৌখীন, নিজে তোমার মতন বই-লেকাও করত, বড় সাধ ছিল মেয়েকে লেখাপড়া শেখায়, বড় হলে মেয়ে আমার বই লিখবে, পাঁচজন বিদ্বানের একজন হবে....তা সে সব সাধ তো খুবই মিটল। এখন তোমরা যদি সে সাধ মেটাতে পার সগ্‌গ থেকে আশীর্বাদ করবে সে।”

কদম আর একটা প্রচণ্ডতর ধাক্কা খেল। অবশ্য বাইরে দেখালো না, তবে আমার দৃষ্টি তো সজাগ রয়েছে, অন্তরে প্রবেশ করে দেখলাম।...চিন্তা করতে করতে একটা কুটিল সন্দেহ উঁকি মারছে আমার মনে,—ঈর্ষা নয়তো? রজতকে নিয়ে? মালী জটাধারীর অভিযোগটা সদ্যসদ্য একচোট একটু অপ্রিয় ব্যাপার সৃষ্টি করে সদ্যসদ্যই নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছিল, আবার একটু একটু করে মনে বিষ সঞ্চার করতে লাগল। রজত এ-বাড়ির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়েছে না হয় সম্প্রতি, কিন্তু আসা-যাওয়া তো অনেক দিন থেকেই। আর রজতের মতো একজন যুবা।

মনে একটা সন্দেহ উদয় হলে যা ঘটে, সব কিছুই সেটাকে যেন পরিপুষ্ট করে তোলে। কদম যে আজকাল মনমরা হয়ে থাকে তাতে আর কোন সন্দেহ নেই। আমার কাছে একটু বেশি সতর্ক থাকে, আসে কম, যখন এল কোন কাজে, একটা যেন হাসির মুখোস পরে নেয়; কিন্তু মুখোস পরে তো সর্বদাই সাধারণ কাজকর্মের

মধ্যে চলাফেরা করা চলে না, তাই ওদিকে গেয়ে রেখেছে যে শরীরটা তেমন ভালো যাচ্ছে না। সুপর্ণা ভালোবাসে, খানিকটা ব্যবধান থাকলেও সখীর মতোই তো, একদিন চিন্তিত ভাবেই বলল।

আমি বললাম—"ভালো কথা নয় তো ; একবার লেডি ডাক্তারকে কল্ দিয়ে না হয় দেখিয়ে দেবে ?"

পাছে কোন ফাঁকে এসেই পড়ে ডাক্তার সেই ভয়ে কদম সুপর্ণাকে সঙ্গে করেই নিয়ে এল আমার কাছে, প্রশ্ন করল—"বাবাঠাকুরের বাঁদীর জন্যে নাকি লেডি ডাক্তার আসছে শুনলুম ?···'না' বলতে পারবেন না, সাক্ষীকে সঙ্গেই ধরে এনেছি।"

বললাম—"তা আসবে বৈকি দরকার হলে। বাঁদী বলে সেকি আর সবার মতন মানুষ নয় ?···তা আছিস কি রকম ?"

"কিন্তু লেডি ডাক্তার আসবার আগেই লজ্জায়-ঘেন্নায় মরে যাবে না বাঁদী ?··আর, থাকার কথা, সেও যেমন রেখেছেন, বাঁদী হলেও মেয়ের বাড়া করে, তাতেই লজ্জা রাখবার জায়গা পাই না ; আর বাড়াবেন না সে লজ্জা।"

সাবধান হয়ে গেল, অর্থাৎ সেই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ভাবটা আস্তে আস্তে কমিয়ে নিয়ে এসে সর্বদাই একটা প্রসন্নতার ভাব ফুটিয়ে রাখতে লাগল। এতে করে কিছু যে একটা চলছেই এ ধারণাটা আমার আরও বদ্ধমূল হয়ে গেল।

আমি আরও সতর্ক হয়ে গেলাম।

রজত টুইশন আরম্ভ করার পর থেকে দুজনের গতিবিধিতে নজর রাখার একটু সুবিধাও হয়েছে। পড়াবার জন্যে আসতেই হয় নিয়মিতভাবে, থাকতেও হয় বেশী, তার ওপর মাঝে মাঝে নিমন্ত্রণ করে ভেতর বাড়িতেও যাতায়াতটা বেশ সহজ করে এনেছি। ছেলেটি প্রিয়দর্শন, মিষ্টস্বভাব, বয়সটাও স্নেহ আদায় করবার মতো, তার ওপর সুপর্ণাকে পড়ানোর একটা প্রত্যক্ষ সম্বন্ধও দাঁড়িয়ে গেছে আপাতত, দয়া-মাসীমারও বেশ একটু টান হয়েছে, ডেকে নেন, গল্প-সল্প করেন। রজত এখন প্রায় বাড়ির ছেলের মতো হয়ে দাঁড়িয়েছে। কদম তো রয়েছেই নজর রাখবার যথেষ্ট অবসর পাই।

অবসরটাকে সুযোগ-বহুলও করে দিলাম খানিকটা। সকালে এসে পড়িয়ে

যায় রজত। একদিন পড়াবার সময়ই এসে বললাম—"বড় গুমট গরম যাচ্ছে মাঝে মাঝে, বাড়িতে আফিসের যা কাজ থাকে তা সকালেই করতে চাই, সন্ধ্যার পর আর বসতে ইচ্ছে করে না, তোমরা না হয় পড়ার সময়টা বদলে নেবে ?"

ওদের উত্তর দেওয়ার আগেই জুড়ে দিলাম—"তোমাদের গুমোট কি কী, অত খেয়াল হবার কথা নয় তো ?"

জবাব দিল সুপর্ণা। পড়াশুনা কতদূর হচ্ছে অত খোঁজ রাখি না, তবে বেশ স্মার্ট হয়ে উঠছে ; হেসে বলল—"না, আমরা তো মানুষ নয়।"

বললাম—"না, মানুষ হবে না কেন ? বলছি পড়া আর পড়ানো এমন জিনিস একেবারে ডুবে থাকতে হয় কি না, দার্জিলিঙে আছি কি বোগদাদে হুঁশ থাকে না তো।"

এ ধরনের কথাগুলো বলবার সুযোগ পেলে আজকাল আর লোভ সংবরণ করতে পারি না, বা করবার প্রয়োজন দেখি না। সুপর্ণা একটু হেসে দৃষ্টি নত করল, রজত নত দৃষ্টি আর তুলতেই পারল না।

এগুলা একটু আধটু উপরি পাওনা, কিন্তু এ ধরনের নজর রাখায়, পরীক্ষা করার জন্যই সময় পালটে সুযোগ সৃষ্টি করে দেওয়ায় কি আনন্দ পাচ্ছি ? মোটেই নয়, একটা যেন গ্লানি লেগে থাকে মনে। তবু যে করে যাচ্ছি তার কারণ আছে। রজতের বিষয় পাকাই করে ফেলেছি, সেই জন্যই কেমন একটা ঝোঁক হয়েছে ওকেও এই তালে একটু ভালো করে বাজিয়ে নিই না। এক-এক সময় হয় মনে এটা অন্যায় হচ্ছে, তখন মনকে প্রবোধ দিই কদমকে ঠিকমতো যাচাই করে নেওয়ার জন্য কতকগুলা সিচুয়েশন তো দরকারই, তারই অপর দিকে রজতের ওপর না হয় রেখেই গেলাম একটু তির্যক দৃষ্টি। একটা প্রবল সাহস আছে মনের মধ্যে কোথাও যে ও এ-সবের বহু উর্ধ্বে, ওকে লক্ষ্য করে এক ধরনের আনন্দই পাই। সুপর্ণাকে বড় ভালোবাসি—যখন যতটুকুই না প্রমাণ পাই যে ওর হাতে খাঁটি রজত তুলে দিচ্ছি, মন আমার আসে ভরে।

ওর দৃষ্টিতে দেখি এক স্বপ্ন। সে-স্বপ্ন এক সময় নিজেও হয় তো দেখেছি, জানি তার মাঝে এমন কিছুই এসে দাঁড়াতে পারে না যা মলিন, যা অসুন্দর। যতই দেখছি ততই হচ্ছি নিশ্চিন্ত।

রঞ্জত থাকে মেসে, যা যা করছি এসবই তাকে এখানে নিয়ে আসবার আয়োজন। নিয়ে আসাটা হবে নিশ্চয় আরও একটা বড় পরীক্ষা, কিন্তু তখন রঞ্জত এ-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। জানি, বড় পরীক্ষাটুকুতেও হবে। হবেই; তখন যে ও ওর এই সোনার স্বপ্নে আরও মশগুল। বাকি থাকে কদমের কথা।

ওকে নিয়ে রয়েছে আশা আর আশঙ্কা দুইই। আশা বৈকি, এই পাঁকের পদ্মটিকেই কি কম ভালোবাসি? ও যে কত শুচিস্নিগ্ধ, কত খাঁটি তার পরিচয় কি দিয়ে দেয় নি এক সময়? অবস্থাবিপর্যয়ে কতগুলা কি এসে পড়ছে, উঠছে মনের মধ্যে কুটিল সন্দেহের বুদ্বুদ, তবুও আশা ও-ও সেই রকম খাঁটি রূপ নিয়েই একদিন আসবে বেরিয়ে; একটা প্রার্থনা জেগে উঠে আমার মনের গভীর অন্তস্থল থেকে—না, ও বেরিয়ে আসুক সেইরকম খাঁটি রূপ নিয়ে হে ভগবান।

মেয়েটাকে সত্যই বড় ভালোবাসি। সেই স্নেহ-ভালোবাসার সঙ্গে আছে একটা নিবিড় কৃতজ্ঞতা। আজ যে আমার রুক্ষ প্রবাস-জীবন ঘিরে এই শ্যামলতা, এই মুকুলিত তরু-লতার মেদুর চঞ্চলতা, এর মূলে তো কদমই। আমার আপত্তি শোনে নি, আমার বিরাগ-বিরূপতার কথা ভাবে নি, একটি ধ্যান-নিরত শিল্পীর মতই আমার চারিদিকে সৌন্দর্য সৃষ্টি করে গেছে। আমি যা চাই, আমার জীবনে যা প্রাপ্য, কী এক গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে টের পেয়ে তা যেন আমার সামনে আস্তে আস্তে বিছিয়ে দিয়েছে।

তবুও যদি প্রয়োজন হয়, সরাতে হবে বৈকি; কিন্তু তার আগে ভালো করে বুঝে নিতে হবে না?···কদম বলেই না এত; অন্য কেউ হলে তো সেদিন মাসীর কথাতেই হত বিদায়; আরও ঢের আগে, এই মাসীর কথাতেই, ঠাকুরের কথাতেই, ওর নিজের স্বামীর কথাতেই।

পূর্বেই বলেছি—রঞ্জতের নিয়োগে হেসে উৎসাহ দেখালেও কদমের যে এতে অন্তরের সমর্থন নেই এটা আমি একরকম ভালো করেই টের পেয়ে গেলাম। টের পেলাম যেহেতু আমি ওর হাসিও চিনি ভালো করে, ওর নীরবতাও চিনি। যাই হোক, আন্দাজে আমি যাই ধারণা করে থাকি না কেন, অনেক দিন পর্যন্তই ও ওর হাবভাব গতিবিধিতে এমন কিছু প্রকাশ পেতে দিলে না যা আমার অনুমানের পরিপোষক হতে পারে। শুধু হয়তো একদিন মাসীমার একটা কথা ছাড়া।

মাসীমা একদিন হঠাৎ অসময়েই আমার ঘরে এসে নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিকভাবে প্রশ্ন করে বসলেন—"হ্যাঁ বাবা, ঠিক ঠিক পড়াচ্ছে তো ?"—

আমি একটু হেসে বললাম—"না পড়ায়, কিম্বা ও-ও না পড়ে, নিজেরাই ভুগবে মাসীমা, নয় কি ?"

মাসীমা যেন একটু থতমত খেয়ে গেলেন, একটু পেছন ফিরেও চাইলেন ভেতরের দিকে, তারপর আমতা আমতা করে বললেন—"না, তাই বলছি—পড়াবেই, না পড়িয়ে যাবে কোথায়—তোমার একতিয়ারের লোক যখন।...আমি বলছিলুম বয়েসটা এখন তো—কি যে বলে..."

আমি হেসে বললাম—"ফাঁকি দেওয়ার। সেই জন্যেই তো বললাম মাসীমা দেয় ফাঁকি, নিজেরাই পড়বে ফাঁকি।...আপনি নিশ্চিন্দি থাকুন।"

"ওমা, আমার কি ভাবনা রেখেছ বাবা যে নিশ্চিন্দি থাকব না ?"

চলে গেলেন। যেন নিষ্কৃতি পেলেন। আমি কান খাড়াই করে ছিলাম, উনি ভেতরের দরজা পেরুবার সঙ্গে সঙ্গে শুনতে পেলাম—"বললুম—কখনও পারে চোখকান বুজে থাকতে ? তা তুই..."

দোরের পাশ থেকেই কে যেন আঙুল উঁচিয়ে মানা করে দেওয়ায় হঠাৎ গলা নামিয়ে একটু বিড়বিড় করতে করতে নিজের ঘরের দিকে চলে গেলেন।

এই একবার চেষ্টা করল কদম। কদমই বৈকি, এ অভিযানের গোড়ায় যে সে-ই তাতে তো আর সন্দেহ নেই। এর পর সব সহজ গতিতেই চলল কিছুদিন। আমার প্ল্যান যেন অনুকূল বায়ুতে পাল তুলে তরতর করে এগিয়ে চলেছে—পড়াবার সময়টা বিকাল পর্যন্ত বাড়িয়ে এনেছে রজত—ওদের স্কুলও দেখলাম একদিন ঘরের গণ্ডী টপকে বাগান পর্যন্ত এগিয়ে গেছে। হাতে আঙুল-দাঁগ-করানো বই দেখে মনে হল পাঠ্য বিষয়েও বেশ খানিকটা উন্নতি হয়েছে—যখন এদিকে এইরকম অবস্থা তখন লক্ষ্য করলাম কদমের মধ্যেও হঠাৎ একটা পরিবর্তন দেখা দিয়েছে কখন।

কদমের সাজগোজের একটু ঘটা হয়েছে।

ওর ছেলেবেলা যে পরিবেশের মধ্যে কেটেছে ওর সেই দাদুর আদরে—আব্দারায়, তারপর বাড়িতেও যেমন জমিদারকন্যার সহচরী হয়েই ছিল, তাতে, ও যে-স্তরের মেয়ে সে-হিসাবে ওর রুচি বেশ মার্জিত, বেশভূষায় একটা পারিপাট্য

আছে এ কথা আগেই বলে থাকব ; কিন্তু এ যা হঠাৎ দাঁড়াল এটাকে ফ্যাশান ছাড়া কিছু বলা যায় না। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় কদম যেন এটা দেখিয়ে শুনিয়েই করছে, অর্থাৎ পরিবর্তনটা যে আমার চোখে পড়বেই সেদিকে ওর যেন কোন সঙ্কোচই নেই।

একদিন এই জিনিসটাই চোখে পড়ল অন্য এক রূপে।

দুপুরে পল্লী যখন নিষুপ্ত, বাড়ির পুরুষেরা কাজে কর্মে ঘরের বাইরে, সেই সময় একটা মুসলমান ফিরিওয়ালা একটা ঠ্যালাগাড়ি করে মেয়েদের মন-ভোলানো সস্তা টুকিটাকি ফিরি করে বেড়ায়—ফিতে, চিরুনি, আরশি, সাবান, লেস, গন্ধ-তেল, জাপানী সিল্কের রুমাল, ছোটদের জন্য কিছু প্ল্যাসটিকের খেলনা, আরও নানারকম জিনিস। স্বভাবতই লোকটার আমার বাসার ফটক পেরুবার কখনও প্রয়োজন হয় নি ; ছুটির একদিন দুপুরে কি একটা শব্দে ঘুম ভেঙে দিয়ে বাইরে এসে দেখি লোকটা ঠেলাগাড়িসুদ্ধ খানিকটা দূরে ঠিক আমার বাসার সদর দরজা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে রয়েছে। দেখেই আমার মনে প্রথম প্রশ্ন উঠল—সুপর্ণা এইসব সস্তা জিনিস কেনে নাকি ?

একটু আড়াল হয়ে দাঁড়ালাম।

একটু পরে কদম বেরিয়ে এল। হাতে কতকগুলা কি সব জিনিস, তার কিছু রেখে দিয়ে, একটা রাঙা তেলের শিশি, একটা স্নোর পট আর একটা সাবান দেখিয়ে বলল—"এইগুলো রাখলুম।"

একটু দর কষাকষি করে পয়সা দিয়ে ভেতরে চলে গেল। যতক্ষণ বাড়িতে রইলাম মনটা আমার সঙ্কোচ আর অনুশোচনায় রইল ভরে। বড় ভুল হয়ে গেছে, এদিকটারও তো খেয়াল থাকা উচিত ছিল।

বিকালে গিয়ে ভালো ভালো কিছু প্রসাধনদ্রব্য নিয়ে এলাম বাজার থেকে। দিশী বিলাতী গোটা দুই দামী এসেন্স, স্নো, কেসক্রীম, ফুলেল তেল—সুপর্ণা যেটা ব্যবহার করে, একটা ফাউন্টেন পেন, একটি খুব শৌখীন চামড়া দিয়ে বাঁধানো চিঠির কাগজের প্যাড, কিছু খাম। একটা সুদৃশ্য ভ্যানিটি ব্যাগও।

ডেকে সামনে ধরে দিতে সুপর্ণা গালে আঙুল চেপে প্রশ্ন করল—"ওমা, আমি এসব কি করব দাদু ? এক কাঁড়ি টাকা খরচ করে যে নিয়ে এলেন !

একবার জিগ্যেসও তো করতে হয়। পাড়াগেঁয়ে মানুষ, কোনটে নিয়ে কি করতে হয় তাও তো জানি না…"

বললাম—"তুমি রাখো দিকিন তুলে। সব কথা কি জিগ্যেস করেই জানতে হয়? দুপুরে যা যা কিনেছ সেগুলো বরং আমায় দিয়ে দাও। সস্তা হলেও নাতনীর হাতের জিনিস তো, আমার কাছে অনেক দাম।"

সুপর্ণা একটু দৃষ্টি স্থির করে ভেবে নিল, তারপরই রীতিমত একটা গণ্ডগোলের সৃষ্টি করে তুলল—"ওমা, সে আমি নাকি?…ও আই-মা। দেখোসে পোড়ার-মুখী তোমার কি কাণ্ড বাধিয়েছে!…ঐ কদম দাদু, না বিশ্বাস হয় আমি ধরে নিয়ে আসছি জিগ্যেস করুন। ওই ফিরিওলাকে মালীকে দিয়ে ডাকিয়ে আনিয়ে একরাশ ছাইপাঁশ নিয়ে এসে বলল—'পছন্দ করে দাও তো দিদিমণি।'…ওমা আমি কি পছন্দ করব লো? মস্ত বড় জহুরী চিনেচিস তো!…জিগ্যেস করুন না সত্যি কি মিথ্যে। আপনি উলটো বুঝে সমস্ত বাজার তুলে নিয়ে এসে জড়ো করলেন। না, আমি এসব নোব না, কোনমতেই নোব না…"

রীতিমতো একটা গণ্ডগোল। রামকানাই, ঠাকুর এক-একটা জায়গা নিয়ে এখানে ওখানে দাঁড়িয়েছে। একবার দৃষ্টি গিয়ে পড়ল কদমও একটা ঘরের দরজার একটু আড়াল হয়ে দাঁড়িয়েছে, মুখে একটু কৌতুকপূর্ণ হাসি। দয়া-মাসীও এসে দাঁড়ালেন। কালা মানুষ, আওয়াজ শুনে একটু হন্তদন্ত হয়ে এসে দাঁড়িয়ে-ছিলেন, তারপর জিনিসগুলার দিকে নজর পড়তে মুখে একটা অদ্ভুত হাসিই ফুটে উঠেছে। সুপর্ণা অনুযোগ করতে মুখে একটু লজ্জা-মেশানো হাসি নিয়ে বললেন —"তা দেবে না? দেওয়ার সম্বন্ধ যে, সেই ভরসাতেই তো আসা। নিবিনে কি, মাথায় তুলে নিতে হবে। একটা পেন্নামও তো করে মানুষ…"

কাঁপা গলা আবেগে আরও গেছে কেঁপে, চোখেও আঁচল তুলেছেন, সুপর্ণা বিব্রত হয়ে ওঠার ভান করে বলে উঠল—"খুব লোক ডেকেছি। তুমিও ওঁর দিকে হয়ে বলতে এলে।…যে মানুষ এরকম ফ্যাসাদে ফেললে তাকে…"

তাড়াতাড়ি সামলে নিয়ে ঝুঁকে প্রণাম করতে করতে বলল—"তা প্রণাম করব না কেন, হাজার বার করছি।…কিন্তু এ আপনি কখনও মনে করবেন না দাদু জিনিসগুলোর জন্যে প্রণাম করছি।…তাই বা কেন?—বেশ, রোজ সকালে

উঠে একবার করে প্রণাম করব, আগাম ; দেখি আপনি কত জিনিস হাজির করতে পারেন…"

ষোলো

গোলযোগ যেটুকু উঠল সেটা নিশ্চয় ফাঁকাই, তবুও এতে ওর হঠাৎ এই শৌখিনীর কথাটা তো বেশ ভালো করেই জাহির হয়ে পড়ল ; কিন্তু সেজন্য কদম যেন একরত্তিও লজ্জিত নয়। এতর মধ্যেও ওর সহজ ভাবটা দেখলে বরং এই-রকমই মনে হয় সবাই দেখুক ওর এই পরিবর্তনটা, দরকার মনে করে ভাবুক, তাইতেই যেন ওর গৌরব।

খুব নেমে-যাওয়া স্ত্রীলোকের মনের ভাব। অথচ ও যে তা নয় এ বিশ্বাসটা মন থেকে কোনমতেই সরাতে পারছি না। মনে হচ্ছে ওর সবই যেন একটা খুব সূক্ষ্ম চাল ; আর, কেমন করে এও যেন মনে হচ্ছে, বাহিরে যতই কটু হোক, এই চালের পেছনে—হ্যাঁ, বাহ্যত এই শৌখিনীর পেছনে আমার জন্যেই প্রচ্ছন্ন রয়েছে কোন শুভ উদ্দেশ্য।

হয় তো ভুল, তবু এই ধরনের ব্যাপারই আগাগোড়া হয়ে আসছে বলে কোন মতেই এই বিশ্বাসটাকে সরাতে পারছি না আমি। এরপর একটা রূঢ়তর আঘাতও লাগল এসে আমার বিশ্বাসের গায়ে ; কিন্তু সে-কথা বলবার আগে দুটো ছোট ছোট অভিজ্ঞতার কথা বলে নিই।

বেড়াতে বেরিয়েছিলাম আফিস থেকে এসে। সুপর্ণার মাথাটা ধরেছে দুপুর থেকে, একটা অ্যাস্‌পিরিন খেয়ে শুয়ে আছে ; ডাক্তার রায়ের কাছ থেকে একটা কিছু নিয়েও আসব। আশ্বিন মাস পড়েছে। অবশ্য এখন গোড়ার দিকেই, তবে আকাশের প্রকৃতি বদলেছে। বেড়ানো প্রায় শেষ হয়েছে, একটু ঘুরে ডাক্তারের কাছে যাব, হঠাৎ পশ্চিমে একদিকে একটা ছোট মেঘের টুকরা ফুলে-ফেঁপে ছড়িয়ে পড়ল ; ঝড় উঠল, বৃষ্টিও আরম্ভ হয়ে গেল।

অতি-সংক্ষিপ্ত নোটিসটা পেয়েই বাড়ি-মুখো হয়েছি, তবু যখন পৌঁছুলাম তখন বেশ ভালোভাবেই ভিজে গেছি।

ঘরে ঢুকেই চমকে উঠতে হল। রজত টেবিলের সামনে একটা ফাইলের ওপর মাথা গুঁজে বসে আছে ; বেশ যেন জবুথবু হয়েই, নিরুপায় ভাবেই। কদম ঘরটা গোছাচ্ছে ; যখন পৌঁছুলাম, জানলার ধারে দাঁড়িয়ে ফুলদানির জল বদলাচ্ছিল, ঘুরে দেখেই একটু থমকে দাঁড়াল, তারপরেই হনহন করে বেরিয়ে ভেতরের দিকে চলে গেল।···

প্রায় তখনই ফিরল, যেটুকু কুণ্ঠা চাহনিতে, গতিতে বোধ হয় এসে পড়েছিল, ভালোভাবেই মিটিয়ে ফেলেছে, শুকনো কাপড় আর একটা গেঞ্জি সামনে বাড়িয়ে ধরে বলল—"নিন, একেবারে যে ভিজে গেছেন।"

আমি একটু চকিত হয়েই বললাম—"ও, কাপড় এনেছিস ?···তা দে।"

"দাঁড়ান আমি চায়ের জলটা চড়িয়ে দিয়ে আসি, একটু আদার রস দিয়ে খেয়ে নিন।"—বলে চলে গেল।

আমি যে দৃশ্যটুকুতেই অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলাম তা নয়। সমস্ত ঘরটি সুপর্ণাকে দেওয়া সেই এসেন্সটার গন্ধে বোঝাই হয়ে রয়েছে।

রজত যেন মাথা তুলতে পারছে না। বুঝেছি ওর অবস্থাটা। একটা আন্দাজও যা করেছি, হয়তো খুব ভুল নয়। সুপর্ণারই জন্যে অপেক্ষা করছিল, তারপর এই চেনা সুবাস ঘরে প্রবেশ করতে নিশ্চয় ফিরেও চেয়ে থাকবে। হয়তো নিতান্ত একটা সাধারণ প্রশ্নের খানিকটা ফসকেও বেরিয়ে পড়ে থাকবে মুখ থেকে ; তারপর থেকেই ভুল ভেঙে এই অবস্থা চলছে। এতটা যে ভিজে গেছি সে সম্বন্ধেও একটা ভদ্রতার কথা বলতে পারছে না। আমিই স্তব্ধতাটুকু ভাঙলাম, বললাম—"সুপর্ণার মাথাটা ধরেছে ; গিয়েছিলে ভেতরে তুমি ?"

বলল—"জানি না তো ? কখন থেকে ধরল ?"

আশ্চর্য ! এ খবরটাও দেয় নি কদম, আটকে রেখেছে ঘরে।

বললাম—"দুপুর থেকেই। অফিস থেকে এসে টের পেলাম আমি। মনে করলাম ডাক্তার রায়ের কাছ থেকে একটা ওষুধ আনি, তা দেখো না, আচমকা এমন বৃষ্টি এসে গেল···"

"নিয়ে আসব ওষুধ আমি গিয়ে ?"—বেশ চঞ্চল হয়ে উঠেছে, তবে বোকা নয়তো, জুড়ে দিল—"আপনার জন্যেও একটা কিছু আনা দরকার, যেরকম ভিজে গেছেন।"

বললাম—"না, তোমায় যেতে হবে না, কাউকে পাঠিয়ে দিচ্ছি আমি চিঠি দিয়ে। তুমি গিয়ে বরং একটু বোসো দিকিন কাছে। কোন পড়ার বই নিয়ে আলোচনা করলে অন্যমনস্ক থাকবে'খন, যাও।"

কথার মধ্যেই কদম এসে পড়ল। রজতকে উঠতে দেখে আমার দিকে চেয়ে বলল—"দিদিমণি ঘুমুচ্ছেন।"

মুখটায় একটা গাঢ় ছায়া পড়েছে।

আমি রজতকেই বললাম—"ঘুমোয় চলে এলেই হবে। যাও।" কদমের মুখের ছায়াটা আরও গাঢ়তর হয়ে গেল। জানলার ধারে গিয়ে ফুলদানিটা তুলে নিল।

আর-একদিনের এইরকম ছোট একটি ঘটনা। আমি ঘণ্টাখানেক আগেই আফিস থেকে এসেছি, একটা ইংরাজী নভেলের খুব চিত্তাকর্ষক জায়গায় এসে পড়েছি, সেটা শেষ করব। বইটা নিয়ে আরাম কেদারাটায় হেলান দিয়ে পড়েছি এমন সময় কানে গেল সুপর্ণা কদমকে বলছে—"শুনছিস, আজ দাদুর আফিস ঘরটা তুই ঠিক করে দিবি? আমায় এত ঠেসে পড়া দিয়ে গেছেন রজতদা, তার ওপর বলে গেছেন আজ সকাল সকাল আসবেন..."

ভেতরেই হচ্ছে কথা, দুজনে তফাতে তফাতে রয়েছে, সুতরাং বেশ জোরেই; আর শোনবার মধ্যে তো দয়া-মাসীমা।

কদম বলছে—"সাতগেঁয়ের কাছে আর মামদোবাজি করতে এসো না বাপু। তোমার রজতদা তোমায় বেশী পড়া দেওয়ার পাত্র বড়!...কার জন্যে রুমালটা হেম্ করছ বলো দিকিন শুনি।"

"জানিস তো আর ন্যাকা সাজছিস কেন? একটু দিস গুছিয়ে ভাই। তিনদিন থেকে আটকে রেখেছি, রোজ হয় নি বলতেও কি রকম লাগে যেন।....না হলে এক কাজ কর না, আমার এখনও হাত সেট হয় নি, তুই-ই না হয় তাড়াতাড়ি দে না ঠিক করে রুমালটা।"

"কদম দাসী অত বোকা নয়, খেটে মরতে কে, যশ নিতে কে।"

"না হয় যশটা তোকেই পাইয়ে দোব, বলব আমার শিক্ষাগুরু কদমই করে দিয়েছে।"

"আর অত রসে কাজ নেই। সবাই যশ দিয়ে রাজা করে দিলে কদমকে, এখন তোমার রজতদা শুধু বাকি···"

বলতে বলতেই ওদিক থেকে এগিয়ে এসেছে। গলাটাও একটু নামল, তবে এমন নয় যে আমার কানের নাগালের বাইরে, কান দুটো সজাগও তো হয়ে উঠেছে বেশি করে। ঐ কথারই জের চলছে—

"শোন দিদিমণি, আজকাল বাবাঠাকুরের দিকে তোমার আটা কমে গেছে···"

গলার স্বরে কতকটা পরামর্শ কতকটা তিরস্কারের ভাব। স্বপর্ণা মুখ ঝামটা দিয়ে উঠল—"অমনি আটা কমে গেছে!···কিসে দেখলি তুই?"

গেছে যে কমে তা আমিও অনুভব করি। এক-একবার একটু দীর্ঘশ্বাস পড়ে, তবে তার সঙ্গে আনন্দও থাকে প্রচুর, আমিই তো কমিয়ে এনেছি, অন্যদিকে আমারই তো সফলতা।

কদমের গলা বেশ ভারী হয়ে এসেছে।

"আফিসঘর গোছানো, সে প্রায় আমারই সারতে হয়, আগে প্রায় গিয়ে বসতে, হাসিঠাট্টা, গল্পসল্প হত—যা উনি পছন্দ করেন,—তা সে এখন একরকম উঠেই গেছে, বাগানেও যদি যাও তো সে আর বাবাঠাকুরের সঙ্গে নয়···"

কড়া ধমকে থামিয়ে দিল স্বপর্ণা—

"আচ্ছা তুই চুপ কর্। তা মাস্টার করে রাখতে গেলেন কেন দাদু? ভুগতে হবে না একটু? ওদিকে হুকুম হয়েছে আসছে বছরই ম্যাট্রিক দিতে হবে। কাজেই ভালো লাগুক না লাগুক, বইগুলো নিয়ে রজতদার সঙ্গে একটু ইয়ে করতে হয়।"

"ম্যাট্রিক দেওয়ারই লক্ষণ বটে!"—কথাটা একটু যেন নাটকীয় একান্তে বলে কদম আবার সেইরকম স্বর গম্ভীর করে বলল—"না, ভুল করছ দিদিমণি, পুরুষের মন তুমি চেন না, যতক্ষণ দাদু-দাদু করে একটু কাছে ঘেঁষে-ঘেঁষে থাকা ততক্ষণই আদর বলো যত্ন বলো, দেওয়া বলো থোওয়া বলো—সব; একবার যদি মনে হল তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করছে, সঙ্গে সঙ্গে মন ভেঙে যায়। ওঁরা একটু সাজগোজ ভালোবাসেন—মেয়েই হোক কি বোনই হোক, কি নাতনীই হোক; তা বলে কি বিবিয়ানা?···"

সুপর্ণা যেন জ্বালাতন হয়ে উঠল, বলল—"আচ্ছা, তুই থাম তো দেখি। বুধ-তলার খিষ্টান পাদ্রীর মতন লেকচার ঝাড়তে এলো দেখো না!...দাদু, তা উর্বশী-মেনকার মতন সাজগোজ করে ঘেরে-ঘুরে না থাকলে তাঁর নাকি মন পাওয়া যাবে না! বলতে পোড়ামুখে আটকায়ও না তো! যা, আমার দ্বারা কিছু হবে না...তোরই তো কাজ ছিল এসব, তুই সামলাবি।"

আফিস ঘর গোছাতে সেদিন অবশ্য সুপর্ণাই এল। কৃতজ্ঞতা আছে, স্বার্থ আছে, এদিকে অভিভাবিকা বলতে একমাত্র এক অশীতিপরা বৃদ্ধা—বোঝবার তো অনেক কিছুই আছে, রাজি করিয়েছে কদম। আজকাল সাজ-পোশাকে সত্যিই একটু যেন অবহেলা থাকে—হয়তো দাদুর চোখে ধূলা দেওয়ার জন্যই। একটা ছাত্রীই তো। কিম্বা হয়তো শহরে এসে সেই জিনিসটায় আস্তে আস্তে পোক্ত হয়ে উঠছে যেটাকে ইংরাজীতে বলে 'আর্টলেস্ আর্ট'। এ দিনে কিন্তু ছিম-ছামই হয়ে এল। বেশ একটু বাড়াবাড়িই আছে বরং, নূতন করে খোঁপা বেঁধেছে (কদমই দিয়েছে বেঁধে), শাড়িটা বদলেছে, ফেরিওলা এসেছিল, একটা নূতন কিনে দিয়েছি কদিন হল, সেইটে পড়েছে, আর অঙ্গ বেড়ে সেই বিলাতী এসেন্সের সুবাসটা।

বেশ বোঝা যায় বাড়াবাড়িটুকু সুপর্ণার দুষ্টামি। কথা কাটাকাটির মধ্যে যে ঠাট্টাটুকু হয়েছিল তখন সেটাকে যেন রূপ দিয়েছে—মেনকা-উর্বশীর মতো সেজে-গুজে দাদুর মন ভোলানো। বই থেকে সন্তর্পণে বার কয়েক চোখ তুলে দেখে এই ধারণাটাই পুষ্ট হল মনে; মুখ টিপে টিপে হাসছে, দু-একবার যেভাবে আড় চোখে ভেতরের দিকে চাইল, বুঝলাম কদম কাছেই আড়ালে রয়েছে দাঁড়িয়ে। তাকে দেখিয়েই বাড়াবাড়ি করে এই ঠাট্টাটুকু তো, নিরীহ দাদুকে টেনে নিয়ে।

বইটা আমার বেশ জমে উঠেছে, তারই মধ্যে এগুলাও এসে পড়ছে। ভাবছি, বেশ, আমার তরফ থেকেও ঠাট্টাটা তাহলে বাকি থাকে কেন? ঠাট্টা অবশ্য সুপর্ণাকে, ওর ঠাট্টার উত্তর; এদিকে কদমকেও তার উপযুক্ত উত্তরটা দেওয়া হয়ে যাবে মাঝখান থেকে, তার চালটা বানচাল করে দিয়ে।

বইটা পড়তে পড়তে যেন অন্যমনস্ক হয়েই উঠে পড়ে বাগানের দিকে চলে

গেলাম। জটাধারী গাছগুলায় জল দিচ্ছিল, বললাম—"ছাড়্ দিকিন, আগে গিয়ে স্টেনোবাবুকে বলে আয় একটু সকাল সকাল এসে পড়িয়ে যেতে। দিদিমণি রাত্তিরে পড়বে না, সিনেমায় যেতে পারে। আর-এক কাজ করবি,—জুঁই ফুলের ছোট গোড়ে দিয়ে আসবি দিদিমণিকে—খোঁপায় পড়বার মতন করে। এখনই নয়, এই যখন পড়তে থাকবে আর কি। যা।" বইয়ের ইণ্টারেস্ট খুবই জমে উঠেছে, তবুও রজত আসবার আগেই উঠে পড়ে বেড়াতে বেরিয়ে গেলাম।

তারপর বেড়িয়ে এসে তিনজনে সন্ধ্যার শোতে সিনেমায় চলে গেলাম। এর অর্থ কদম যা বোঝে।

বেড়াতে বেড়াতে সেদিন ওর আচরণটাই মনকে আলোড়িত করছিল। দুটো ঘটনা থেকে একটা জিনিস তো আরও পাকা করেই সাব্যস্ত হচ্ছে—কদম যেমন রজতকে আকৃষ্ট করবার চেষ্টা করছে, তেমনি অন্যদিকে সুপর্ণার মনটাও ওর দিক থেকে টেনে নিয়ে আর পাঁচ দিকে ছড়িয়ে দিতে চায়। মাসীমার সেবায়, আমায় স্নেহ-চর্যায়, খানিকটা পূর্বের মতো ওর নিজের সাহচর্যেও। একই ব্যাপারের দুটো দিক।

ওকে পরীক্ষা করে নিতে চায়? কিন্তু লক্ষণ মিলিয়ে তাও তো মনে হয় না। তবে কি ওর হাতে অন্য পাত্র আছে? এক ওর রতনদাদার কথা বলত বটে মাঝে মাঝে। তাকেই উদ্দেশ করে, তার লোভ দেখিয়ে নিয়ে এসেছে মাসীমাকে? বলছে না এই জন্যে যে নিয়ে আমার ফন্দিটা প্রকাশ হয়ে পড়বে আমার কাছে? রজতকে ও সুপর্ণার এত অনুপযুক্ত ঠাওরালে কিসের জন্য? ভাবছি···আর কটা দিন যাক, আর একটু লক্ষ্য করে যাই, তারপর না হয় ওর কাছে সমস্ত প্রসঙ্গটা তুলে ওকে এই কথাটাই খোলাখুলি জিগ্যেস করব। বিয়ের কথাটা তো এখনও স্পষ্ট করে তোলাও হয় নি।

চিন্তা করতে মনে হল উচিতও একবার জিগ্যেস করা। একটা কিছু লোভ দেখিয়ে ওই তো নিয়ে এসেছে দয়া-মাসীমাকে। এইসব ভাবতে ভাবতে আবার স্নেহটাও আসে ফিরে, কোথা দিয়ে কি করে ওর প্রতি বিশ্বাসটাও হয় দৃঢ়তর।

সতেরো

তারপর, যেমন বলছিলাম, একদিন একটা রূঢ়তর আঘাত এসে লাগল সেই বিশ্বাসের গায়ে।

রজতকে মেস ছাড়িয়ে আমার বাসাতেই নিয়ে এসেছি।

এবারে কার্তিকের মাঝামাঝি পূজা। ছুটিতে বাড়ি যাব; অনেকদিনই যাই নি, মিঠে-কড়া স্বরে নানা হস্তের চিঠি আসছে; ভাইয়েদের, ছেলেমেয়েদের, নাতি-নাতনীদেরও—যাদের হাতে স্বর বেরুতে আরম্ভ করেছে একটু-আধটু।

যাওয়ার আগেই বিয়ের ব্যাপারটা শেষ করে যাব। অবসর সময়ে সেই প্ল্যান এখন ছকি বসে বসে। দিনও কাছাকাছি দুটো ঠিক করে ফেলেছি।

বাড়িতেও লিখেছি। বিয়ের কথা বলে নয়, ওটা বলবও না, এখান-ওখান দুটো জায়গার পক্ষেই ওটা হবে একটা যেন হঠাৎ-কিছু, আকস্মিকতায় সবার মনে জাগিয়ে তুলবে একটা চমক। এমন সার্থক রোমান্স গড়ে তুলতে যাচ্ছি, তার মধ্যে এই বিস্ময়-রসটাও থাক না। লিখেছি, একটা দরকারে বাসায় একটা ছোট-খাট উৎসবের আয়োজন করছি; সবাইকে আসতে হবে, তারপর ওটা সাঙ্গ করে সবাই এক সঙ্গে যাব। লিখে দিয়েছি একটু যে অনিশ্চয়তা আছে তার জন্য এর-পর আর একখানা চিঠি পেলে সবাই চলে আসবে।

অনিশ্চয়তার কথা আগেই এক জায়গায় বলে রেখেছি; অর্থাৎ রজতকে এইটে আমার শেষ পরীক্ষা। যেভাবে আগের সব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে এল তাতে শতকরা সিকি ভাগও সন্দেহ নেই আর; তবুও এটুকুও মিটিয়ে নিই না। বলি নি?—সুপর্ণার হাতে একেবারে নিকষিত-খাঁটি সোনা তুলে দোব।

তাই এখানেও কাউকে মুখ ফুটে এখনও বলি নি। অবশ্য এখানে জানছে সবাই, চাকরদের মধ্যে কানাঘুষা হয়; কদমের যে পছন্দ নয়—যে কারণেই হোক —ওর অনুমোদনের হাসির অন্তরালে সেটা সুস্পষ্ট; দয়া-মাসী তো উঠতে-বসতে আশীর্বাদ করছেন। তবু স্পষ্ট কথায় এখনও বলি নি। এ পরীক্ষাটুকুতেও উতরে যাক না।

বেশ কঠোর পরীক্ষাই দিতে হল রজতকে।

ও এসেছে পর্যন্ত প্রায় রোজই আমরা সামনের মাঠটায় বেড়াতে যাই সন্ধ্যার একটু আগে। শুক্ল পক্ষ চলেছে।

পূর্ণিমার দিন বেরুবার আগে হঠাৎ আমার একটু আত্মত্যাগের ভাব এসে গেল। মনে হল, শারদীয়া পূর্ণিমা, পূর্বরাগের এ দিনটি ওদের জীবনে আর আসবে না তো; আমি আজ মাঝখানে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াই কেন? বললাম—"তোমরা দুজনে বেরিয়ে এসো, আজ আমার আর হয়ে উঠল না।

সুপর্ণা মনে মনে নিশ্চয় ধন্যবাদই দিয়ে থাকবে, বাইরে মুখ রাখার জন্য বলল—"সে কি দাদু, এমন পূর্ণিমার রাত, কোথায় আরও চাড় করে যাবেন ··"

বললাম—"পূর্ণিমা তো সবার কাছে সমান বেশে এসে দাঁড়ায় না ভাই; যার কাছে যে-ভাবে আসে সেইভাবেই অভ্যর্থনা করে নেওয়াই ভালো। আমি বরং রামকানাইকে বলি বাতের মালিসটা বের করুক একটু।"

"আপনি থাকলে কেমন আনন্দ হত····"

বললাম—"ভুল বলছ, আনন্দের প্রসেশনে একজন যদি ল্যাংচাতে থাকে···"

রজত মুখটা ঘুরিয়েই নিয়েছিল; সুপর্ণা বলল—"আরম্ভ হল কথার ফুলঝুরি। ···চলুন রজতদা; কে পারবে ওঁর সঙ্গে?"

ওরা চলে গেল। বেরুব বলে বারান্দা থেকে নেমেই এসেছিলাম ওদের সঙ্গে, ঘুরতেই চোখে পড়ল কদম দরজার একটু আড়াল হয়ে চোখে কেমন যেন একটা বিরূপ চাউনি নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমি ফিরতেই সহজ হয়ে এগিয়ে এল, প্রশ্ন করল—"আপনি যে গেলেন না?"

বললাম—"হাঁটুর বাতটা যেন আওড়াবে মনে হচ্ছে, পূর্ণিমা তো। তুই একবার রামকানাইকে ডেকে দে তো। অমনি কলকেটাও নিয়ে যা।"

খুব বেশী না হলেও একটু রাতই হয়ে গেল ওদের, তার মধ্যে কোনও একটা ছুতো মুখে করে কয়েকবারই বাইরে এল কদম, ক্রমেই বেশী চঞ্চল হয়ে পড়ছে। ···ওরা ফিরে স্বভাবতই আজ আর এদিকে এল না, ওদিককার দরজা দিয়েই ভেতর বাড়িতে চলে গেল।

লোক-দেখানো মালিসের পর্বটা শেষ করে আমি গোটা দুই জরুরী ফাইল নিয়ে বসেছিলাম, রজতকে কিছু ডিক্‌টেশন দেওয়া দরকার হয়ে পড়ল।

আমার আফিস ঘরের অপর দিকে একটা টানা বারান্দা লম্বালম্বি সোজা চলে গেছে। তারই শেষের ঘরটায় রজত থাকে। ওরা ফিরে আসবার পরই আমি ওকে ডেকে নিয়ে আসবার জন্যে উঠে গেলাম, ওরা এদিক দিয়ে গেলে বলে দিতেই পারতাম, তা তো গেল না।

কাছাকাছি যেতেই একটা চাপা ক্রুদ্ধ আওয়াজ কানে যেতে খানিকটা আগেই থেমে গেলাম আমি। সন্দেহ হয়েই ছিল, পা টিপে টিপে এগিয়ে যেতে টের পেলাম কদমেরই আওয়াজ।

বলছে—"বারবার বলছি আপনাকে—শুনতেই হবে আমার কথা—নৈলে…"

"নৈলে কি ?"

কতকটা যেন মরিয়া হয়ে প্রশ্ন করল রজত।

"নৈলে এমন অবস্থা করব—যেমন আদর করে নিয়ে এসেছেন বাবাঠাকুর সেইরকম অপমান করে বের করবেন। চাকরি পর্যন্ত যাবে।"

"যায় যাবে। তোমাকেও তো চিনবেন, এত যে বিশ্বাস করেন।"

এসে এখনও দরজাটা খোলে নি রজত; বুঝলাম সুপর্ণা যে মুখহাত ধুয়ে কাপড় ছাড়তে গেছে সেই সুযোগটুকু নিয়েই তাড়াতাড়ি তার বক্তব্যটা শুনিয়ে দিতে এসেছে কদম—পুরোপুরি সেটা যাই হোক না কেন। পুরোপুরি শোনবার অবশ্য অভিরুচি নেই আমার। এমনিই গাটা ঘিন-ঘিন করছে; তবে কোথায় কিভাবে দাঁড়িয়ে আছে, মুখের ভাবটা কি, দেখবার একটা কৌতূহল হচ্ছে। এ ধরনের সাক্ষাৎকার যে হচ্ছে কদিন থেকে সেটা তো বুঝতেই পারছি।

পা টিপে টিপে আমি দরজা ছেড়ে জানলার ধারে চলে গেলাম। খুব সন্তর্পণে হাতটা বাড়িয়ে পর্দাটা আস্তে আস্তে টেনে নিয়ে একটু যে ফাঁক রইল তার কাছে মুখটা নিয়ে গেলাম।

রজত আমার দিকে পেছন ফিরে চেয়ারটাতে বসে আছে, সামনেই টেবিলে হাত দুটো রেখে কদম সিধে হয়ে আছে দাঁড়িয়ে, বিদ্যুতের আলোয় ওর চোখের বিদ্যুৎ যেন শতগুণ হয়ে ঠিকরে বেরুচ্ছে—তাতে ঈর্ষা, লালসা, আক্রোশ, অভিসন্ধি

—একটা নিম্ন-গামিনী মেয়ের সব কদর্যতা যেন ঠাসা রয়েছে। রজতের কথায় একটু চুপ করে কি ভাবছিল, একটা অভিসন্ধিই আঁটছিল নিশ্চয় মনে মনে, ঠোঁট দুটোর কোণ চেপে বলল—"অবিশ্বাস করলে আমার ক্ষতিটা কতটুকু? ওদিকে একটুও বিশ্বাস করলে আপনার ক্ষতিটা কত বড় সেটাও একবার খতিয়ে দেখবেন। আজ পর্যন্ত ভালো ভাবেই বলে যাচ্ছি আপনাকে, এবার অন্যপথ ধরব…"

পেছন দিকেও মাঝে মাঝে ঘুরে দেখছিল, কেউ এসে পড়ে কিনা, "ভেবে দেখুন ভালো করে"—বলে ভেতরের দিকে ঘুরতেই আমি তাড়াতাড়ি সরে এলাম এবং তখনি পায়ের শব্দ করে এগিয়ে গিয়ে দরজায় ধাক্কা দিয়ে ডাকলাম—"রজত আছ?"

দরজাটা ভেজানোই ছিল। বোধ হয়, যদি রজত বেরিয়ে এদিক দিয়েই আসে তো খুলে দিতে খানিকটা সময় না যায় সেইজন্য কদমই ব্যবস্থাটা করে থাকবে; আমি ঠেলতেই খুলে গেল। ঠিক এই সময় কদমও ওদিককার পর্দা সরিয়ে গেল বেরিয়ে।

রজত উঠে দাঁড়িয়েছে, ভাবটা খুবই বিশ্রস্ত, প্রশ্ন করলাম—"কে গেল, সুপর্ণা নাকি?…একটা কথা ছিল ওর সঙ্গে।" রজতের দৃষ্টি নত হয়ে গেল, তখনই তুলে আমার মুখের ওপর ফেলতে ওর ঠোঁট দুটো থরথরিয়ে কেঁপে উঠল, বলল—"না স্যার।"

প্রশ্ন করলাম—"তবে?"

রজত মুখটা দুহাতে ঢেকে একেবারে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। কিছুই বলতে পারছে না, যেন কি ভাবে বলবে বুঝতেই পারছে না; আমি পিঠে হাত দিয়ে প্রশ্ন করলাম—"তা হলে কদম?" আরও উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে যেন ভেঙে পড়ল রজত—

"হ্যাঁ স্যার,…আমায় দেশে চলে যেতে দিন…যেমন ছিলাম—এখানে থাকলে আমায়…."

আস্তে আস্তে পিঠে হাতটা টেনে যেতে লাগলাম আমি, বললাম—"বুঝেছি, বলতে হবে না তোমায়।…একটু বেশি লাইসেন্স পায় আমার কাছে—তার

জোরে চাকরগুলোর ওপর মাতব্বরি করে বলে যদি কোথায় নিজের সীমা না বোঝে তো ওর শেষ হয়ে এসেছে।"

এতটা ঠাণ্ডা হয়ে এত বড় গুরু অভিযোগ সম্বন্ধে মন্তব্য করা যে বেমানান হল তা বুঝছি। ঠিক যা করবার করেই ফেলেছি, তবে সন্ত সন্ত মেজাজ ঠিক না রেখে একটা কিছু করে বসলে তো সব দিক দিয়েই আরও কুশ্রী হয়ে পড়ত। ওর কাঁধের ওপর দুটো লঘু আঘাত করে বললাম—"দুঃখ কোরো না, চিয়ার আপ্; শীগগিরই হচ্ছে এর বিহিত।...মুখহাত ধুয়ে একটুখানি এসো তো আ'ফিস ঘরে, দুটো দরকারী চিঠি আছে, সকালের ডাকেই যাওয়া চাই।"

আর দেরি করা চলে না। ওর অনুকূলে যে ধারণাটা এত করে পুষে রেখেছিলাম আজ স্বচক্ষে ওর বুভুক্ষার নগ্নরূপ দেখে তা তো একেবারেই বিলুপ্ত হয়ে গেল। তা ভিন্ন আমি জানি রজতকে, আজ আরও ভালো করে জানলাম, কিন্তু দয়া-মাসীমা তো জানেন না, আর এইরকম একটা দৃশ্যের একটা কণাও যদি পড়ে যায় সুপর্ণার চক্ষে! আজই তো পড়ে যেতে পারত!

প্রথমে বলে দেখব রামকানাইকে, যতটা পারি চোখে আঙুল দিয়েই বলতে হবে, না ফল হয়, গাড়ি ডাকিয়ে, টিকিট করিয়ে একেবারে হাতে দিয়ে দেওয়া; ঢাকীসুদ্ধ বিসর্জন।

সেদিন সুবিধা হল না; একটু আলাদা করে নিয়ে বলতে হবে তো। মনটা খিঁচড়ে ছিল বলেও অনেক ভেবেচিন্তে আর তাড়াহুড়ো করলাম না। টাটকা রাগের মুখে যদি অবাঞ্ছনীয় কিছু বেড়িয়ে পড়ে মুখ দিয়ে, রাগ বেড়ে গিয়ে যদি একটা হৈ-চৈ-ই করে বসি।

তারপর দিন রাত্রে একসময় সন্ধান নিয়ে জানলাম রামকানাই বাসায় নেই, আউট্ হাউসের দিকে গেছে। ঐখানেই কথাবার্তার সুবিধা হবে। আমি এগুলাম। খানিকটা যেতেই দেখি রামকানাই মালীর সঙ্গে গল্প করতে করতে এই দিকেই চলে আসছে। নিকটে আসতে প্রশ্ন করলাম—"জটাধারী, তুই যে এখনও বাড়ি যাস নি?"

বললে—"রামকানাইদার সঙ্গে একটা জরুরী কথা ছিল বাবু। এইবার যাচ্ছি।"

চলে যেতে রামকানাইকে বললাম—"একবার আউট হাউসের দিকেই এসো।"

যেতে যেতেই আরম্ভ করলাম—"কদমের কথা বলছিলাম···এসেছে, সে অনেক দিন হয়ে গেল তো···"

বলল—"জটাধারীও ওর কথাই বলছিল এতক্ষণ···"

আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম, প্রশ্ন করলাম····"জটাধারী?···সে আবার কি বলছিল?"

রামকানাই খুব অল্প একটু লজ্জিত হাসি নিয়ে মুখটা নীচু করে রইল। আমি বেশ একটু আগ্রহান্বিত হয়ে উঠেছি, মালীর কথাবার্তায় হয়তো এমন কিছু থাকতে পারে যাতে কদমকে সরানো অপেক্ষাকৃত সহজ হয়ে পড়ে; ওকে সেই-ভাবে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বললাম—"বোধ হয় মিথ্যে করে এক ভাঁই লাগিয়েছে তোমার কাছে।···তা মিথ্যে হোক, সত্যি হোক আমি বলছিলাম যখন শত্রু লেগেছে ওর পেছনে···।" রামকানাই সেই হাসিসুদ্ধুই মুখটা তুলে বলল—"শত্রুতে তো ওর কিছু করতে পারবে না বাবু; তা সপ্তরথীর মতন ঘেরে নিয়েই দেখুক না। সবাই তো অভিমন্যু নয়।"

মনে মনে বললাম—তা বটে।

কি উত্তরটা দোব ভাবছিলাম, একবার মুখটা খুলে যেতে ওই বলে চলল—"তা জটাধারী যে শত্রুতা করেই বলেছে একথা কেন বলব? বলেছে ঠিকই, এর স্বভাবটা তো জানি, আজ বিশ বছর একসঙ্গে ঘর করছি, চোখ বুজে তো থাকি নি। ···বলেছে ঠিকই, তবে···"

বিরতিটা আবার দীর্ঘ হয়ে যায় দেখে তাগাদা দিলাম—"বলেছেটা কি?"

রামকানাই আবার কুণ্ঠিত দৃষ্টি তুলে বলল—"মানা করে দিলে যে।···তা আপনি মুনিব, আপনাকে বলব বৈকি। কদমও তো ওকে মানা করে দিয়েছিল বলতে, তা দিলে তো বলে শেষ পর্যন্ত—আর আমাকেই···"

আমি একটু উস্কানি দিলাম—"এমন যে কড়া লোক!"

কড়াই হয়ে উঠল রামকানাই, বলল—"তা রেখেছি বৈকি খানিকটে।···তুই বাড়ির ঝি, মুনিবের পা জড়িয়ে পড়ে আছিস, থাক্, তোর এসব কথায় দখল

দেওয়ার দরকার কি ?···আজই সন্ধ্যের কথা বাবু, বাসি নয়। মালীকে টিপে দিয়েছিল সন্ধ্যের পর একটু আটকে যেতে। একটা ভালো তোড়ার কথাও বলে রেছল—একটা ভালো ফুলের তোড়া নিয়ে সন্ধ্যের পর আউট-হাউসের দিকে ওপিক্কে করবে। মালী বললে—কি বলব রামকানাইদা, ফিচেল মেয়ে মানুষ, ভয় করে তো, সেই ভয়ে ভয়ে বাছাবাছা গোলাপের একটা তোড়া করে একটু আড়াল দেখে ওপিক্কে করছি, রানী সেই দেমাকী চাল নিয়ে উপস্থিত। জিগ্যেস করলুম, কী ব্যাপার ? বললে—আমার বেশী ফুরসত নেই সব বুঝিয়ে বলবার—মোদ্দা কথাটা হচ্ছে, কাল হোক, পরশু হোক, সকাল হোক সন্ধ্যে হোক, মুনিব যখন ডেকে জিগ্যেস করবেন—আর করবেনই জিগ্যেস—এ তোড়া তুমি কি মাস্টার মশাইকে দিয়েছিলে ? বলবে, হ্যাঁ, হুজুর তাঁরই ফরমাসে তাঁকে করে দিয়েছিলুম। এমনি ফরমাস করেন মাঝে মাঝে। এখেনে এসে ইস্তক একটু বেশিই বরং ; মানা করে দেন বলে আর বলি নি হুজুরকে—শুনছি দিদিমণির সঙ্গে বিয়ে হয়ে বাড়ির লোকই হতে যাচ্ছেন তো।"

কথাটা শেষ করে একটা বোকার মতো হাসি মুখে করে রামকানাই চেয়ে রইল আমার দিকে। আমি একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেছি। উদ্দেশ্যটা কি ?

যাই হোক না কেন উদ্দেশ্য, কিন্তু আর নয়। বললাম—"কথাটা তো ভাল নয় রামকানাই, নিজের কানে শুনলে অবিশ্বাসও তো করতে পার না।"

"অক্ষরে অক্ষরে সত্যি বাবু, দেখছি তো এই বিশ বছর একনাগাড়ে।"

"তাহলে কি করবে ? রেখে আসবে ?···না হয় দিন কতকের জন্যেও···"

রামকানাইয়ের মুখের ভাবটা একেবারে বদলে গেল। হাত কচলাতে-কচলাতে মাথাটা একটু নীচু করে রইল, তারপর আবার একবার তুলে করুণ দৃষ্টিতে চেয়ে বলল—"তাহলে আর বাঁচবে না বাবু, দুটো দিনের জন্যেও সরিয়ে দিলে বাঁচবে না।"

ভাবাটা একটু রাগেরই বেরিয়ে পড়ল, বললাম—"হুট করে এত তাড়াতাড়ি মরবে ?"

মরলে ক্ষতিটা কি ?—এ প্রশ্নটা অনেক কষ্টে চেপে গেলাম। রামকানাই খুব কাঁচুমাচু হয়ে, যেন না বলে আর উপায় রইল না এইভাবে হাত কচলাতে

কচলাতে বলল—"এখানে তবু সত্যি চোখের সামনে দেখছে, ডাকলে সাড়া পাচ্ছে…"

প্রায় বলে ফেলেছিলাম—হতভাগা, তুমি আর কতদিন ডেকে সাড়া পাবে সে হুঁশ আছে?…অনেক কষ্টে সংযত করে নিলাম; যা করবার সে তো ঠিকই করে রেখেছি, এর সঙ্গে বৃথা বাক্যব্যয় করে ফল কি?

বললাম—"ভেবে দেখো ভালো করে। ওকেও না হয় বলে দেখো না, আমার নাম করেই না হয় বলবে—বাবু জিগ্যেস করছিলেন…"

"যাবে না বাবু; আপনের কষ্ট হবে সেটা তো ও বরদাস্ত করতে পারে না কিনা। এসে ওবধি ক্রেমাগতই তো ফন্দি আঁটছে কিসে মনিবের…"

আবার একটু সংযম হারাতে হল, বললাম—"আর এই যে ফন্দি রামকানাই —'বাবু জিগ্যেস করলে বলবি—এ তোড়া মাস্টারমশাইকে দিয়েছিলুম'—কী বলতে চায় ও, কি উপকারটা হবে মনিবের বুঝিয়ে বলতে পার? না, আমি চাই না বাড়ির ঝি সে সন্ধ্যের পর গিয়ে মালীর কাছ থেকে ফুলের তোড়া নিয়ে আসবে ওস্তাকতা করে অন্য কথা বলতে শেখাবে—বাড়ির মাস্টারের নামে,—এসব বরদাস্ত হয় কখনও?—বারণ করে দেবে, এরপর এ ধরনের কিছু যদি হয় দুজনকেই যেতে হবে তোমাদের…"

আর "যদি" নয়; ঠিক করেই ফেলেছি। বাকি শুধু কি ভাবে বিদায়টা হবে সেইটে একটু ভেবেচিন্তে স্থির করে নেওয়া। ওকে যে কথাগুলো বললাম তার উদ্দেশ্য কদমকে বললে সে যদি মানে মানে নিজেই সরে পড়বার উদ্যোগ করে।

আঠারো

কি হত জানি না, তবে তার সময়ই পেল না রামকানাই।

সেদিন বিকাল পর্যন্ত আকাশ পরিষ্কারই ছিল, সন্ধ্যার মুখে হঠাৎ গেল বদলে। এবং রাত একটু এগুতেই জোর বাতাসের সঙ্গে বৃষ্টি নামল।

সদর বারান্দায় বসবার উপায় নেই, আহার সেরে ঘরের ভেতরই তামাক-সেবনের পর্বটা শেষ করলাম। বাইরের দিক থেকে হাওয়া, সেদিককার দোর-জানালা বন্ধ, অপরদিকের দরজাটা বন্ধ করে এবার আমি শুতে যাব, অর্ধেকটা করেছি বন্ধ, দেখি পাশের বারান্দার ওদিকে রজতের ঘরের দোরটা খুলে গেল এবং বুকের কাছে যেন তোড়ার মতোই কি একটা নিয়ে কদম একটু সন্তর্পণেই বেরিয়ে এল। দোরটা ভেতর থেকে বন্ধ হয়ে গেল।

আমি এদিকে দরজাটা প্রায় বন্ধ করে দিয়ে সামান্য একটু ফাঁক রেখে দাঁড়িয়ে রইলাম। কদমের ভাবটা বেশ ছমছমে; পা টিপে টিপেই চারিদিকে চাইতে চাইতে, বিশেষ করে আমার দরজার দিকে লক্ষ্য রেখে এগিয়ে এল, তারপর মাঝামাঝি এসে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাবে, আমি দরজাটা খুলে চৌকাঠের বাইরে এসে বললাম—"কে, কদম না? এদিকে আয়।"

কদম ঘুরে দেখার সঙ্গে সঙ্গেই কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল, ওদিকে তোড়াটাও বুকের কাছে লুকিয়ে নিয়েছে। ঝড়-বৃষ্টি চলছেই, আমিই একপা এগিয়ে যেতে ও যেন সম্বিৎ ফিরে পেয়ে ও-অবস্থার পক্ষে একটু দ্রুতই চলে এসে সামনে মাথা হেঁট করে দাঁড়াল। প্রশ্ন করলাম—"তোর আঁচলের ভেতর কী ও?"

মাথা হেঁট করে চুপ করে রইল। প্রশ্ন করলাম—"ফুলের তোড়া না?… কোথায় পেলি?"

প্রশ্নটার পুনরুক্তি করতে একবার যেন ভয়ে ভয়ে আমার মুখের পানে চাইল, তারপর ঘাড়টা অল্প বেঁকিয়ে একবার রজতের ঘরের দিকে চেয়ে নিয়ে আবার মাথাটা নীচু করল।

প্রশ্ন করলাম—"রজত দিয়েছে, না?"

চুপ করেই রইল। আমিও একটু ভেবে নিয়ে প্রশ্ন করলাম—"এখনও তোরা বোধ হয় কেউ খাস নি—রামকানাই, ঠাকুর, তুই ?"

মৃদুস্বরে উত্তর দিল—"ওরা খাচ্ছে।"

"তুইও খেয়ে নিগে। তারপর ওরা দুজন খেয়ে দেয়ে আউট-হাউসে চলে গেলে, রজত-স্বর্ণারাও শুয়ে পড়লে তুই সোজা আমার এই অফিস ঘরে চলে আসবি ; আমি বসেই থাকব।"

বলল—"আমি খাব না।"

কণ্ঠস্বরটা রুক্ষ করে নিয়ে বললাম—"যা বলছি, কড়া-ক্রান্তিতে ঠিক সেই রকমটি হবে।…ঘরের মধ্যটা দিয়েই চলে যা ভেতরে, ভিজতে হবে না।…তোড়াটা টেবিলের ওপর রেখে যা।

রামকানাইয়ের খাওয়া হয়ে গেলে কলকেটা সেজে দিয়ে যেতে বলবি।"

এর একটু পরে রামকানাই এসে কলকেটা বদলে দিল। ঠাকুর বারান্দাতে অপেক্ষা করছিল, দুজনে দুটো টোকা মাথায় দিয়ে আউট-হাউসের দিকে চলে গেল। একটু পরে কদম আস্তে আস্তে এসে পাশে দাঁড়াল। ঘাড়টা একটু ঘুরিয়ে দেখে বললাম—"সামনে এসে দাঁড়া।…তোড়ার ব্যাপারটা কি ? ঠিক ঠিক করে বলে যাবি।"

একটু মাথা নীচু করে থেকে আঁচলটা হাতে নিয়ে একটু তুলতে যাবে, আমি সটকা থেকে মুখটা সরিয়ে নিয়ে কড়া চোখে চেয়ে বললাম—"শোন কদম, তুই নাটুকেপনা বা অভিনয় যতটুকু করেছিস তার জন্যেই তোকে মোটা বকশিশ করা চলে, আর চোখের জল বের করতে হবে না। তোড়াটা তোকে রজত দিয়েছে, এই জানাতে চাস তো ? এইবার আমি বলি ?—রজত এর বিন্দু-বিসর্গও জানে না। তুই তোড়াটা সোজাসুজি মালীর হাত থেকে আজ বিকেলে নিয়েছিস।"

মুখটা তুলল, একেবারে ছাইপানা হয়ে গেছে সমস্ত রক্ত নেমে গিয়ে, তবু চেষ্টা করল—"আমি…আমি…সত্যি বলছি বাবাঠাকুর…"

নলের মুখটা তুলে ধরে বললাম—"ঐ পর্যন্তই থাক, নৈলে…"

রামকানাইকে আর জড়ালাম না ; এমনই তো তার আর কিছু পদার্থ রাখে

নি। বললাম—"নৈলে জটাধারীকে ডেকে পাঠাব এক্ষুনি। সে এসে কী বলবে শুনবি ?"

ফ্যাল ফ্যাল করে মুখের পানে চেয়ে রইল। ওর চেহারায় এতটা নিরুপায়-ভাব কখনও দেখি নি এর আগে। বললাম—"বলবে—তুই-ই ওকে আজ একটা ভালো তোড়া তোয়ের করে সন্ধ্যের পর আউট-হাউসের কাছে থাকতে বলেছিলি। তারপর দেখা করে তোড়াটা নিয়ে বলেছিলি—আমি যদি টের পেয়ে জিগ্যেস করি তো বলবে তোড়াটা ও রজতকে দিয়েছিল—এখানে আসা পর্যন্ত প্রায় রোজ—রজত মানা করে দেওয়ায় আমায় জানায় নি।...মিলছে ?"

শুনে যাচ্ছে, যেন হুঁশ নেই একেবারে, চোখ দুটো আমার মুখের ওপর যেন অবশভাবে ফেলা। প্রশ্নটা করতে একটু চকিত হয়ে উঠে বলল—"মালী-ওদের সঙ্গে আমার সম্বন্ধটা কিরকম জানেনই তো..."

বললাম—"তোর চেয়ে বেশীই জানি ; নৈলে তুই এত বুদ্ধিমতী হয়েও এতবড় ভুলটা করবি কেন ?...যাক, এসব গেল ওদিককার কথা। এবার এদিককার প্ল্যানটা মিলিয়ে মিলিয়ে আমায় ঠিক ঠিক উত্তর দে দিকিন। বুঝতেই পারছিস সব জেনেশুনে আমি একটা ঠিক করে বসে আছি। মিথ্যে বলে কোন ফল হবে না, শুধু জিভই নোংরা হবে।"

এরপর তো আমার নিজের আন্দাজ, সুতরাং অন্যদিক দিয়েও ওর মনটা একটু ভেজাবার চেষ্টা করলাম, বললাম—"জিভ নোংরা করার কথায় বলি—তোর এ দোষটা ছিল না আগে, হয়তো আমার ওপর একটা শ্রদ্ধা ছিল তোর, আর সেই জন্যেই..."

কদম মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে হাত দিয়েই চোখ দুটো একবার মুছে নিল, বুকে খানিকটা হাওয়া ভরে নিয়ে বলল—"বলুন, দিচ্ছি উত্তর।"

এদিকেও বেশ গুছিয়ে প্ল্যান করা মনে হচ্ছে, কোথা থেকে আরম্ভ করি ? সটকায় দুটো টান দিয়ে ভেবে নিয়ে বললাম—"তোকে এখন যে রজতের ঘর থেকে বের করে দরজা দিলে সে রজত নয়, রামকানাই।"

একটু চকিত হয়ে উঠলই কদম, তারপর সামলে নিয়ে বেশ সহজ কণ্ঠেই উত্তর করল—"হ্যাঁ।"

"তোর কথামতোই ও আমার অফিস ঘরের আর সব দোর-জানলা বন্ধ করে এদিককার বারান্দার দোরটা খুলে রেখেছিল।"

"হ্যা।"

"যাতে বেরুবার সময় সহজেই আমার নজরে পড়ে যাস।"

চুপ করেই সম্মতি জানাল।

"ওদিকে রজতকে কোনরকমে বুদ্ধি করে ভেতরে আটকে রেখেছিলি, তার ঘর খালি পাওয়ার জন্যে।"

"হ্যা।"

"কি করে?···থাক, সেটা তত দরকারী কথা নয়।"

"বলছি। পানে বেশি করে চুন দিয়ে দিছলুম। মুখ থেকে ফেলে দিতে বললুম, দিদিমণি, তুমি দুটো সেজে দাও ভাই, আমার বাবাঠাকুরের ঘরে একটা দরকারী কাজ পড়ে রয়েছে—তাইতে কেমন যেন মনেরও ঠিক নেই, ভুল হয়ে যাচ্ছে।···চোর চায় ভাঙা বেড়া তো? স্টেনোবাবুও বসে রইল ওনার ঘরে পান নেওয়ার ছুতো করে।"

বেশ সহজকণ্ঠে বলে গেল, শেষের কথাটা আক্রোশে আর অসম্মানে ঠাসা।

খানিকক্ষণ চুপচাপ গেল, সময়ের স্রোতটা যেন হঠাৎ থেমে গেছে। আমার গড়গড়ার ভুড়ুক-ভুড়ুক শব্দটা একটু যা বীচিভঙ্গ তুলছে। তারপর এই আক্রোশের সূত্র ধরেই আমি আবার প্রসঙ্গটা তুললাম, বললাম—"সব তো বুঝলাম, তুই নিজেও আর কিছু লুকিয়ে রাখলি নি।···কিন্তু কেন?"

চুপ করেই রইল।

প্রশ্ন করলাম—"ও তোর কোন শত্রুতা করেছে?"

গোমরা মুখ করেই বলল "শত্রুতা কেন করতে যাবে?"

"যাবেন বল। একটা ভদ্র পরিবারের ছেলে; নিজে ভালো, তা ভিন্ন এটাও তো আর লুকুনো নেই কারুর কাছে যে আমি তাকে মাসীমার জামাই করতে যাচ্ছি।"

চুপ করেই রইল। বললাম—"অথচ, অথচ তোর ভাবগতিক দেখে বোধ হয় তুই সেটা চাস না। এইরকম সব চক্রান্ত করে ওকে রীতিমতো অপদস্থ করে

বাড়ি থেকে যেন তাড়াতে চাস। অনেকদিন থেকেই তুই একটু একটু করে ইসারায় যেন জানিয়ে যাচ্ছিস, গা করছি না দেখে তুই আজ এমন একটা কাণ্ড করে বসেছিস যা সত্যি হলে—সত্যির কথা থাক, আমি যদি টের পেয়ে না যেতাম কোনরকম করে তো ওকে আজ এই দুর্যোগের মধ্যেই বোধ হয় বের করে দিতাম।···আর, তুই-ই কি রেহাই পেতিস ?—বল না ভেবেচিন্তে।"

রাগটা বেড়ে যাচ্ছে বলে চুপ করে গেলাম একটু। তারপর আবার সুরটা বদলে সহজ বিচার-যুক্তির এবং খানিকটা প্রশ্রয়ের সুরেই বললাম—"শোন, কদম, তুই যা করলি, বুঝতেই তো পারছিস তাতে তোর সঙ্গে এভাবে মিষ্টিকথায় আলোচনা করবার কথা নয়, তবু যে করছি তার কারণ আজ তোর উদ্দেশ্যটা ধরতে না পারলেও এটা তো দেখে এসেছি তুই ভুল পথ ধরেছিস অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু এ-বাড়ির অনিষ্ট করার উদ্দেশ্য কোনকালেই থাকে নি তোর। তাই একবার জিগ্যেস করতে চাই কেন রজতের প্রতি এত আক্রোশ তোর ? তোর সন্ধানে কি কোন অন্য পাত্র আছে—রজতের চেয়ে ভালো ?"

একটু যেন সচকিত হয়ে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে সহজভাবেই বলল—"হতে পারে না ভালো ? ওই···উনিই বা কী এমন···"

সেই আক্রোশের নিঃশ্বাস ফিরে এসেছে আবার। বললাম—"হাজার গুণ ভালো হতে পারে। কিন্তু···বেশ শুনিই না কি রকম পাত্র আছে তোর জানা। তুই মেয়ে-ছেলে, তা ভিন্ন তোর অবস্থার মেয়েছেলের তো বেশি জানবার কথাও নয়, তবুও যদি জানিস তো শুনি না হয়।"

চুপ করেই রইল মুখটা গোঁজ করে। বললাম—"অবিশ্যি আর উপায়ও নেই। আমার পছন্দ রজতকে, দয়া-মাসীমাও খুব পছন্দ করেন···"

"একেবারে পছন্দ নেই ওঁর।"—হঠাৎ মুখটা সোজা করে তুলে এমন জোরের সঙ্গে স্পষ্টভাবে বলল, ও এতক্ষণ যেভাবে চলছিল তার থেকে এতটা তফাত যে, আমি একেবারে হতচকিত হয়ে গেলাম। প্রশ্ন করলাম—"তার মানে ?···এ যে একেবারে নতুন কথা শুনছি !···"

তারপর একটু ভেবে নিয়ে বললাম—"বেশ, ওঁর কথা ওঁর সঙ্গেই হবে। তোকে যা জিগ্যেস করছি—ছিল তোর হাতে কোন পাত্র ? যা বলছিলাম—

এখন আর উপায় নেই, ধরে নিলাম দয়া-মাসীমার পছন্দ নয়—তোর পছন্দর দিকে ওঁকেও টেনেছিল—আমার খাতিরে আমার পছন্দয় সায় দিচ্ছেন,—কিন্তু সুপর্ণার মন তো জানি, তাই থেকে তার মতটাও…"

"বিয়ের কনের আবার মত…দেখছেনই তো একটা বুড়োর হাতে পড়ে কি রকম নাকাল হচ্ছি।"

মরিয়া হয়ে গেছে, এত স্পষ্ট কথা আমার সঙ্গে এই প্রথম। ঠাণ্ডা হয়েই বললাম—"বুঝলাম।…তোকে যে জিগ্যেস করছি—আর উপায় না থাকলেও, তা এই জন্যে যে—এটাও তো মনে করতে পারব যে ছিল সন্ধানে আরও ভালো পাত্র, সেই জন্যে কদম, ভুল হলেও, ভালো জেনেই একটা বাগড়া দেওয়ার চেষ্টা করেছে। তোকে মেয়ের মতন ভালোবেসে এসেছি,—উপায় নেই আর, তবু একটা সান্ত্বনাও তো থেকে যেত…"

নরম কথা একেবারে সইতে পারছে না, মুখটা ঘুরিয়ে যেন খুব চেষ্টা করে অশ্রু সামলে নিলে কদম, তবু ওপরের দিকটা একটু যেন কেঁপে উঠলই। বললাম—"তোর জানাশোনার মধ্যে যতদূর শুনি দুটি পরিবার আছে—যেখানে তোর এর-ওর সুপারিশে হয়তো খানিকটা কথাও চলতে পারে—এক, তোদের দেশের জমিদার—তাঁর মেয়ের সঙ্গে তোর ভাব—একবার যেন বলেছিলি দুটি জ্ঞাতি-ভাইও আছে তার—জামাইয়ের সঙ্গে টেক্কা দিয়ে বিলাত-ফেরত করে আনতে চান জমিদারবাবু…"

কদম মুখ তুলে আবার তখনি নামিয়ে নিল। বললাম—"তা এটা তো বুঝিস যে জমিদার ঘর আমাদের নাগালের বাইরে। তারপর ছেলেবেলায় যেখানে ছিলি…"

কদম এমনভাবে হঠাৎ মুখ তুলল, আমার মনে হল যেন যা খুঁজছিলাম পেয়ে গেছি এতদিনে। তখনই কিন্তু দৃষ্টি নামিয়ে নিল। আমি বেশ উৎসুক হয়েই বলে চললাম—"যেমন গল্প করিস, পরিবারটি ভালো ;—সেখানে তোর এক রতনদাদার কথাও বলেছিস মাঝে মাঝে…"

কদমের মুখটা হঠাৎ এত উজ্জ্বল হয়ে উঠল, মনে হল যেন অন্ধকারের মধ্যে পায়ের তলায় একটা প্রশস্ত বাঁধানো পথ পেয়ে গেছে। নিজেকে সংযত রাখবার

চেষ্টা করেও খানিকটা উৎসাহ-কম্পিত স্বরেই বলে উঠল—"কেন? রতনদা কি কারুর চেয়ে কম? পাঁচটা পাস—অবস্থা আপনার স্টেনোবাবুর চেয়ে ঢের ভালো....সময় দিন না দেখি চেষ্টা করে..."

আমি আবার একটু ধাঁধায় পড়ে গেলাম—এখনও অভিনয় নাকি? কিন্তু ও চিন্তাটা আপাতত ঠেলে রেখে বললাম—"এই ছাখো! তবে এতক্ষণ শুনলি কি? আর কি নতুন করে চেষ্টা চলে?..."

কদম দুপা এগিয়ে থপ করে বসে পড়ে আমার একটা পা ধরল, বলল—"চলে বাবাঠাকুর, আমায় একটু সময় দিন, রতনদা যে কত ভালো, কী উঁচু যে বংশ... আগে বলি নি তার কারণ আপনি হঠাৎ স্টেনোবাবুকে নিয়ে এলেন এর মধ্যে—এখনও হতে না পারে এমন নয়—আপনি এ বিয়ে রদ করে দিন বাবাঠাকুর..."

বিব্রত হয়ে বললাম—"শোন কদম, সেটা সম্ভবও নয় একেবারেই আর তাতে ভালো না হয়ে মন্দই হবে, বুঝতেই তো পারছিস কতদূর এগিয়েছে।...আমি জানি, তুই যেমন আমার ভালো চাস—বরাবর চেয়ে এসেছিস, তেমনি মাসীমারও ভালো চাস বলেই তাঁদের একটা আশা দিয়ে এখানে নিয়ে এসেছিস—এখন যেন মনে হচ্ছে তোর সেই ছেলেবেলার দাদুর বাড়িরই আশাতেই, কিন্তু বড্ড দেরি করে ফেলেছিস যে! এখন এ বিয়ে ভেঙে দিলে—আর সব কথা বাদ দিলেও, একবার স্বপর্ণার কথাটা ভেবে দেখ দিকিন—মঙ্গল আছে এতে?...না ওঠ, পা ছাড়। এত বুদ্ধিমতী তুই—তোর ওপর ভরসা করেই এত বড় একটা কাজে নেমেছি আমি, কোথায় উৎসাহ করে লেগে যাবি, না, যা না হবার তাই নিয়ে... যাদের ভালোবাসিস তাদের খারাপ হবে জেনেও .."

পা ছাড়বে কি একেবারে মাথা গুঁজড়ে শুয়ে পড়ল কদম, সঙ্গে সঙ্গে আপসানি আর কান্না—

"ও বাবাঠাকুর, আমার উৎসাহ আর থাকবে কি করে—সবাই নিজের নিজের স্থবিধে বুঝে, নিজের নিজের পছন্দ নিয়ে সরে দাঁড়াল আমায় একা ফেলে, আমি এখন দাঁড়াই কোথায়?...বিদায় করতে চেয়েছিলেন বাবাঠাকুর, যাই নি, আজ ভগবান তার সাজা দিলেন আমায়—আমি এত আশা করে কী পেলুম শেষ পর্যন্ত—এতবড় সংসারটায় কোথায় আমার ঠাঁই রইল বাবাঠাকুর?..."

ঝঞ্ঝা-বৃষ্টি বেড়েছে। কিছুই তো বুঝতে পারছি না এই রহস্যময়ী নারীর বেদনাটা ঠিক কোথায়, তাইতে আমার মনটাও এক-একবার করে উথলে উথলে উঠছে অকারণেই। মাথায় ডান হাতটা টেনে দিতে দিতে বললাম—"এত কাতর হোস নি কদম, ওঠ বাছা। কত ভুল করেছিস, শত্রু বাড়িয়ে ফেলেছিস, কিন্তু আমার ব্যবহার কখনও বদলাতে দেখেছিস? আজকেও কত বড় ভুল একটা হতে যাচ্ছিল, কিন্তু আমি তো জানি তোর ভেতরটা···কোনও ভয় নেই তোর। আমি যতদিন রয়েছি, ঠাঁইয়ের অভাব কি তোর? মেয়ের মতন করে সংসারটা যেমন গুছিয়ে এনেছিলি আবার নতুন করে নতুন মানুষ দিয়ে গুছিয়ে তোল।···

রতনে-রজতে যে কোন তফাত হবে না সে কথা দিচ্ছি তোকে।···ওঠ লক্ষ্মী মেয়ে।"

উনিশ

অনেক রাত পর্যন্তই চোখের পাতা বুজতে পারি নি। এলোমেলো ঝোড়ো হাওয়ার মধ্যে যে চিন্তার সূত্রটাই ধরতে যাচ্ছি যেন ছিঁড়ে ছিঁড়ে যাচ্ছে। তারই ভেতর একটা সিদ্ধান্ত কিন্তু ঠিক রেখে গেলাম,—আর দেরি করা মোটেই নয়, এবং সবাইকে স্পষ্ট কথায় জানিয়ে দেওয়াও দরকার; এতদিন পর্যন্ত এইটে ধরে নিয়েই চলছে যে সবাই তো বুঝতেই পাচ্ছে হাওয়াটা কোন দিকে বইছে।

ভেবে দেখলাম—বুঝতে তো কদমও পেরেছিল, তবু একটা কিরকম অন্তঃসলিলা বইছিল ওর মনের মধ্যে এতদিন—কাকে অবলম্বন করে কি একটা ভুল আশায়।···আর, এই যে দয়া-মাসীমার কথা বললে—মোটেই চান না রজতকে; এটা কি? ওরই নিজের আক্রোশেরই একটা উচ্ছ্বাস নাকি?

সে ভয়টাও হল। এমনও তো হতে পারে যে রতনের কথা স্পষ্ট করে যদি আগে নাও বলে থাকে তো এবার তাঁকে ভাঙিয়ে নেবে নিজের দিকে এই ভরসাতেই পূর্বাহ্নেই গেয়ে রাখলে কথাটা আমার কাছে। মাসীমার ওপর স্বভাবতই ওর যেরকম প্রভাব তাতে এটা খুবই সহজ হবে ওর পক্ষে। কথাটা মনে উদয় হতে বেশ অস্বস্তিই বোধ করতে লাগলাম। পরদিন প্রথমে ওঁর কাছেই

গেলাম। জপে বসেছিলেন, বললাম—"মামীমা, সুপর্ণার বিয়ের দিনটাও তাহলে ঠিক করে ফেলি এবার পুরুত ডেকে।···পাত্র তো আপনার পছন্দই বলছিলেন—রজতের কথা বলছি আর কি ?"

মালা ঘোরানো একটু বন্ধ হয়ে গেল মামীমার, হাসি-হাসি মুখটাও অল্প একটু যেন নিভে এল, বললেন—"ঐখানেই ঠিক করলে তাহলে ?······কদম বলছিল বটে।···তা ভালোই, বেশ ছেলে।···আর বেশ যদি নাও হত—তোমার পছন্দ বাবা, তুমিই যখন ভার নিয়েছ···"

জিগ্যেস করলাম—"অন্য কেউ ছিল নাকি মামীমা ?"

একটু যেন থমকে গেলেন মামীমা, তারপর বললেন "ঐ কদমই বলছিল বাবা।···তা এও বেশ হচ্ছে, দেখছি তো দুটিকে, বেশ মানানসই—আর ছেলেও বড় ভালো রজত—আজকাল প্রায়ই এসে বসে তো—দিব্যি হাসিখুশি···"

রজতকে আফিসে আমার চেম্বারে ডেকে বললাম। জানতই তো, প্রতি দিন, প্রতি রাতটিকে স্বপ্ন-মণ্ডিত করে এসেছে, সুযোগ করে দিয়ে গেছি আমিই বেশির ভাগ, তবু নূতন করে শোনার যে উল্লাসটুকু হল তাতে মুখে একটু হাস্য ফুটিয়ে মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইল।

বললাম—"তোমার বাবাকে চিঠি লিখে তাঁর মতও আনিয়ে নিয়েছি, দিন চারেক হল এসেছে তাঁর চিঠি···"

রজত সেইরকমভাবেই মাথা নিচু করে বলল—"একটা চিঠি আমায়ও দিয়েছেন স্যার। দু-তিন দিনের মধ্যে আসবেন।···নিজের থেকে তাঁর কৃতজ্ঞতা জানাতে চান···আমি আপনার দয়ায় লিফ্‌টটা পেলাম তার জন্যে···"

বিয়ের কথাটা বাদ দেওয়ার জন্যেই নিশ্চয় এই চাকরিতে উন্নতির কথাটুকু বিশেষ করে জুড়ে দিল। আমি কথাটাকে আবার টেনে নিয়ে এলাম, একটু বিস্মিত হয়ে বললাম—"এই দ্যাখো ! ও সামান্য লিফ্‌ট—গোটাকতক টাকা মাইনে বাড়া—তার জন্যে যদি সশরীরে এসে কৃতজ্ঞতা জানাতে হয়—তাহলে যেখানে মনে করছি স্বর্গে তুলে দিলাম তাঁর ছেলেকে তার জন্যে কৃতজ্ঞতা জানাবার কি পথ খোলা রৈল তাঁর ?"

সুযোগ হলে এইরকম আজকাল বলি, তার ওপর আজ শব্দটা তো আরও স্পষ্ট হয়ে এল। লজ্জা পেয়ে গেছে, কি করে দাঁড়ায়, কি করেই বা পালায়, এই ভাব। বললাম—"তা বেশ ভালোই হল, একলা পড়ে গেছি, দুজনে পরামর্শ করে সব ঠিক করা যাবে···যাদের কাজ তাদের তো ফিরে চাইবার ফুরসত নেই এদিকে।"

তারপর সুরটা বদলে, যার জন্য ওকে চেম্বারে ডাকিয়ে আনা সেই কথাটা এনে ফেললাম।

বললাম—"তোমায় একটা কথা বলা বিশেষ দরকার রজত, সেইজন্যে বিশেষ করে এইখানে ডেকে পাঠালাম। রামকানাইয়ের পরিবার কদমকে নিয়ে তোমার কতকগুলো খারাপ অভিজ্ঞতা হয়ে গেছে; একটা তো কাল আমার দেখতাই হল···"

রজত মাথাটা তুলতে গিয়ে আবার সঙ্গে সঙ্গে নামিয়ে নিল; মুখটা রাঙা হয়ে গেছে। এরকম একটা অপ্রিয় প্রসঙ্গ, আমি আর বিলম্ব না করে একেবারে মাঝখানে এসে পড়লাম, বললাম—"ওকে কিন্তু ক্ষমা করতে হবে তোমায়, সবকিছু একেবারে মনে থেকে মুছে ফেলতে হবে।"

সব লজ্জা-সঙ্কোচ সরে গিয়ে ও চোখ তুলে স্থির দৃষ্টিতে আমার মুখের পানে চেয়ে রইল, যেন বুঝতে পারছে না আমি কি বললাম। আমি বলে চললাম—"হ্যা, তোমার খুবই আশ্চর্য মনে হবে, কিন্তু ও যা করে গেছে তার সঙ্গে ওর মনের কোনও যোগ নেই। ও মেয়েটা প্রায় বছরখানেক হল আমার কাছে রয়েছে, ও স্তরের এরকম অদ্ভুত প্রকৃতির মেয়ে এর আগে আমার চোখে পড়ে নি; আশ্চর্যরকম বুদ্ধিমতী, আর শুনলে বিশ্বাস করা শক্ত, স্বভাব-চরিত্রের দিকে আশ্চর্যরকমই নির্মলও, ও যে স্তরের মেয়ে, আর যা অবস্থা ওর সে-হিসেবে খুবই আশ্চর্য; আমি কয়েকবারই ভেবেছি সরাব ওকে, কিন্তু সরাই নি; পরে বুঝেছি সরালে ভুল হত। এটা ওদিককার কথা বলছি। এদিকে এসে—অর্থাৎ যবে থেকে সুপর্ণার বিষয়ে তোমার কথা ভেবেছি তবে থেকে ওর আচরণটা আবার এত অদ্ভুত হয়ে উঠেছে যে আমি ঠিক করে ফেলেছিলাম এবার ওকে সরাবই এখান থেকে, তারপর পরশু তোমার কাছে সব শুনে—ওকে

তোমার ঘর থেকে বেরুতেও দেখে আমি ওকে সরাবার ব্যবস্থাটাই করছিলাম, এমন সময় একটা ব্যাপার হল, যাতে আমার আবার সেই মনের ভাবটাই ফিরে এল রজত, যে ওকে তাড়ালে একটা ঘোর অন্যায় হত।"

রজতের দৃষ্টিতে এবার একটা অতি বিস্মিত প্রশ্ন ফুটে উঠল। আমি বলে চললাম—"তোমার সঙ্গে ওর আচরণটা কিরকম হয়েছে জানি না, খুঁটিয়ে জানার ইচ্ছেও নেই। তবে আমি যা দেখলাম কাল রাত্রে তা কল্পনাতেও আসে না। সে তোমার শুনে কাজ নেই, বলাও সম্ভব নয় আমার পক্ষে, শুধু এইটুকু বলি তোমায়, ওটা হল বলেই আমি ওর আসল রূপটা আবার দেখতে পেলাম। আমি ওকে ক্ষমা করেছি, তাই তোমায়ও সব মন থেকে মুছে ফেলতে বলছি।"

রজত কুণ্ঠিতভাবে বলল—"আপনি এত করে বলছেন কেন স্যার ?"—

কথাটা বলে এমনভাবে চেয়ে রইল, আমার মনে হল ওর আরও যেন কিছু বলবার আছে। আমি কিছু না বলে প্রতীক্ষাই করে রইলাম। রজত আরও একটু সংকুচিত হয়ে বলল—"আমিও তো তত খারাপ মনে করি না স্যার—ও শুধু আমায় চায় না এ বাড়িতে···তার কারণ···"

আমি হঠাৎ এত ব্যগ্র হয়ে উঠলাম যে রজত কথার মাঝে ঘাবড়ে গিয়ে চুপ করে গেল।

ব্যগ্রভাবেই প্রশ্ন করলাম আমি—"তার কারণটা কি জান তুমি ?"

রজত মুখটা আবার নীচু করল, আমি আর অপেক্ষা করতে না পেরে বললাম—"ও চায় না এ বিয়েটা, নয় কি ?"

রজত সেইভাবেই থেকে উত্তর করল—"হ্যাঁ স্যার।"

"কোথায় চায়···বলেছে কি তোমায় ?"

"আমায় বলে নি কিছু, তবে···"

"শুনেছ কি ?—অন্য কারুর কাছে ?···কোথায় হলে ওর পছন্দ ? আর একজায়গায় ছেলেবেলায় থাকত ও···কিছু বলে নি কারুর কাছে ?···সুপর্ণাকে বলতে পারে, শোন নি তুমি ?···ও হয়তো সেখানে কথাবার্তা আগে ঠিক করেই এদের নিয়ে এসেছে···তারপর আমায় বলতে সাহস পায় নি····"

কোনমতেই আর কোন কথা বের করা গেল না। শুধু বোঝা গেল যে ও

যা শুনেছে তা স্থপর্ণার কাছেই, আর তার সঙ্গে বিবাহ নিয়ে আলাপ-আলোচনার কথা এসে পড়ল সেই লজ্জায় মুখ খুলতে পারল না। ব্যাপারটা দুজনের স্বার্থের বিরুদ্ধে ছিল বলেও যে দুজনে লুকিয়েছে—এরও তো একটা লজ্জা আছে। আমি আর কথাটা বাড়িয়ে ওকে এই সঙ্কোচের মধ্যে ধরে রাখতে চাইলাম না। বললাম—"বেশ, যাও এখন, ভুলে যেও সব কথা; আর, স্থপর্ণার কানে কখনও যেন না ওঠে এসব। থাকতে থাকতেই ভালো করে চিনবে মেয়েটাকে; আপনিই ক্ষমা করতে পারবে। যাও।"

স্থপর্ণার কাছে কথাটা একটু ঘুরিয়ে তুললাম, বললাম—"যেমন দেখছি তাতে মনে হচ্ছে একটা স্বয়ংবরসভা ঠিক করলেই ভালো হত।"

স্থপর্ণা বলল—"আমিও সেইরকম ভয় করছিলাম দাদু, যেমন ঢ্যাঁটড়া পিটিয়ে আরম্ভ করেছিলেন..."

"ঢ্যাঁটড়া?..."

"পাঁচখানা কাগজে বিজ্ঞাপন; ঢ্যাঁটড়া আর কাকে বলে?"

"তোমার কাছে হার মানবার আনন্দে না হয় মেনে নিলাম, কিন্তু তোমার আশঙ্কাটা ছিল কিসের শুনি? হতই না হয় স্বয়ংবরসভা একটা।"

"না দাদু, এই বেশ আছি, কোথায় বাঁশ বনে ডোম-কানা হয়ে ঘুরে বেড়াতাম?"

"বাঃ, আর আমি যে শুনলাম সব ঠিকই ছিল। দময়ন্তী কি একালের সংযুক্তার মতন শুধু সভার মধ্যে গিয়ে টুপ করে যথাকণ্ঠে মালাটি গলিয়ে দেওয়া।"

"তাহলে সেই একটি কণ্ঠের ব্যবস্থা করলেই তো হত দাদু, অত ভিড়ের কথা কেন?"

"মুশকিল হয়েছে সেটি যে কার বর-কণ্ঠ তা তো টের পেলাম না। সেই জন্যেই তো স্বয়ংবরের কথা।"...

"টের পেয়ে কাজ নেই দাদু। তিনি যেই হোন, তিনিও যখন টের পান নি, কোন গণ্ডগোল বাধাতে আসছেন না...আমি তো এই সার বুঝেছি।"

আমিও ঘুরিয়ে নিলাম কথাটা। হয়তো ঠিকমতো জানেও না। এটাও তো বুঝতে পারা যাচ্ছে যে কদম যদি স্পষ্টভাবে তুলেই থাকে কথাটা তো সে শুধু

দম্মা-মামীমার কাছেই। তা ভিন্ন এতদূর এগিয়ে, এখন, কি হতে পারত সেটা নিছক একটা কৌতূহলের বিষয় বৈ তো নয়। বললাম—"সেইটেই সার কথাও। গণ্ডগোল বাধাতে এলেও যখন আর কোন আশা নেই তাঁর। এই কথাটাই জিগ্যেস করতে চাইছি আমি—তাহলে এগিয়ে যাব তো যেমন যাচ্ছি?"

"বাঃ রে! যখন আরম্ভ করেন তখন চেয়েছিলেন আমার অনুমতি?"

মুখটা একটু ঘুরিয়ে নিয়ে হেসে বলল—"তাহলে দিতাম অনুমতি যেন!"

আমি বললাম—"না, তখন সব অজানা তো, পেতাম না অনুমতি; এখন তো বিশ বাঁও জলে হাবুডুবু, আর অনুমতি না দিয়ে উপায় নেই, তাই এসেছিও নিতে।"

"ইস্, উপায় নেই!"—বলে হেসে চলে গেল।

কুড়ি

কাজ পুরোদমে এগিয়ে চলেছে। আর মাত্র দিন পাঁচেক বাকি।

রজতের বাবা এসেছিলেন, তাঁকেও ছেলের বিয়েতে কন্যাপক্ষের হয়ে খুব খানিকটা খাটিয়ে নিলাম; আজ সকালে ফিরে গেলেন, যথাসময়ে বরকর্তা হয়ে আসবেন।

চমৎকার লোক, নৈলে রজতের মতো ছেলেও হয় না। সর্বসাকুল্যে দেখছি কদম যে সংসারটির গোড়াপত্তন করে দিল তা বেশ নিখুঁত হয়েই গড়ে উঠছে এখন পর্যন্ত। কুটুমও বেশ ভালো হল।...

তবু মনের কোথায় একটা কাঁটা বিঁধে রয়েছে, নড়তে-চড়তে খচখচ করছে। গোড়াপত্তন করেছিল বটে কদম, কিন্তু যা হতে যাচ্ছে তা তো চায় নি।...কি চেয়েছিল তাহলে?

সন্ধ্যায় বারান্দায় ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে গড়গড়ার নটকা হাতে নিয়ে সেই কথাই ভাবছিলাম।...সেদিন পা জড়িয়ে কাঁদতে কাঁদতে কদম অতকথা যে বলল তা কী তবে? আমার অবশ্য মনে হচ্ছে এই বেশ হল, কিন্তু সেটা তো রজতকে

ভালোবাসতাম বলে ; নয়তো সত্যই কি এর চেয়ে ভালো হতে পারত না ? পৃথিবীতে আরও ভালো হওয়ার—তারপরেও আরও ভালো হওয়ার কত যে সম্ভাবনা রয়েছে। ভাবছি, শুধু একটিমাত্র সান্ত্বনা সম্বল করে, রতনই যদি ওর মনে ছিল তো গোড়াতেই বলল না কেন তার কথা ? ঘূণাক্ষরেও কেন জানাল না ? ওর পছন্দই হয়তো ছিল আরও ভালো।

লোকজন খাটছে, বাড়িঘর, উঠান, বাগান সব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হচ্ছে, জিনিস-পত্র এসে পড়ছে, আরও সব লোকের আনাগোনা।....একদিনকার সেই মনিব আর দুটি চাকরের নিঃসঙ্গ নিরালা বাড়ি !

আজও সব-কিছুর কেন্দ্রে আবার সেই কদম। ভুলে গেছে নিজের কথা, সেই প্রসন্ন মুখ, হাসি-তামাসা ; তারই একদিকে আবার শাসন-ভ্রূকুটির স্ফুরণ মাঝে মাঝে ; ভাঁড়ার থেকে নিয়ে বাইরে পর্যন্ত সর্বত্রই তো একা কদম।

না, মুখে এতটুকু বেদনা বা নৈরাশ্যের কোথাও নেই কিছু। হয়তো ও নিজেকে বর্তমানের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিল সম্পূর্ণভাবে ; কিম্বা হয়তো নিজের বেদনা-নৈরাশ্য মনের একেবারে সুদূর কোথাও রেখেছে লুকিয়ে ; সে ক্ষমতাটা তো ওর ভালো রকমই আছে।

আমার মনে কিন্তু সেই ওর বেদনাই কি করে এসে উঁকি মারছে মাঝে মাঝে।

কী চেয়েছিল কদম ? ওর সীমাবদ্ধ ক্ষুদ্র পৃথিবীতে যেখানে যেখানে ওর প্রাণের যোগ আছে—শৈশব থেকে আজ পর্যন্ত, সব কি একটি কেন্দ্রে এনে ফেলে ওর স্নেহ-প্রীতির তন্তু দিয়ে বেঁধে ফেলতে চেয়েছিল ?...এই যে রচনা এতে আমার কতটুকু কৃতিত্ব যে ওর একটি পরম সুযোগ আমি এ-ভাবে করলাম নষ্ট ?...একটি মেয়ে সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে চাইছে আমায় খুশী করতে অথচ একটি চরম ক্ষণে আমিই তাকে করে রাখলাম অসুখী, তাও কেমন করে, না, সেই আমার সুখটুকুই দিয়ে যা ওরই সৃষ্টি।...এখনও কি নেই উপায় ?...এত বড় একটা আনন্দের গায়ে একটা ছায়া এসে এসে পড়ছে।

বর্ষার সন্ধ্যায় সামনের বাগান থেকে কতকগুলা ঝিঁঝির সমতান উঠে একটা করুণ পূরবীর সৃষ্টি করেছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে এই চিন্তাটাই আমার মনে আবর্ত

সৃজন করে চলেছে—ও যার কথাই ভেবে থাকুক মনে মনে, যাই ঠিক করে থাকুক, সব কিছুর মূলে ছিল ওর বাবাঠাকুরের সুখস্বাচ্ছন্দ। ভাইঝির বিয়ে দিন বাবাঠাকুর "…ঘর জামাই করে এখানেই রাখুন।… রতনদার বোন খুকু এখন ষোলো-সতেরো হল, দিন না, ভাইপোরা তো রয়েছে…আমি যদি থাকি তো করবই একটা ব্যবস্থা, এই বলে রাখলুম…"

মনে পড়েছে কবে কি বলেছে শুধু আমায়ই সুখী করবার জন্য। শুধু বলাই নয় ভেতরে ভেতরে চেষ্টাও করে গেছে কত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে।… আমারই সুখ, শুধু আমারই সুখ…

ক্রমে চিন্তাটা ধুঁয়ার বিচিত্র রেখার মতোই নিজের মধ্যে কুণ্ডলী পাকাতে পাকাতে একটা আকার পরিগ্রহ করল—সে আকার যেমন অভিনব তেমনি অদ্ভুত।…আমার এতদিনের সমস্ত দুশ্চিন্তা কর্পূরের মতো কোথায় গেল উবে।… না, আর সন্দেহ নেই তিলার্ধও। কদিন থেকে সবার মুখে যা শুনে এলাম—কদম, দয়া-মাসীমা, এমন কি রজত, সুপর্ণা—সব কিছুরই নূতন করে ভাষ্য রচনা করতে হবে। রামকানাইকে ডেকে বললাম—"কলকেটা আবার সেজে আন, একটু বেশি করে তামাক দিবি।…আর জলটাও ফেলে দিয়ে নতুন জল ভরে দে।"

•

ভুল নয়। চুপিসাড়ে প্রমাণ আর সমর্থন খুঁজছিলাম, একেবারে হৈ-চৈ করে এসে পড়ল।

তার পরদিন ফুলশয্যার বাজার করতে গিয়েছিলাম। অন্যদিনের মতো রজত আর সুপর্ণাও সঙ্গে রয়েছে। যখন ফিরলাম সন্ধ্যা উত্তরে গিয়ে বেশ একটু গা-ঢাকা গোছেরই হয়েছে। জন-মজুর সব চলে গিয়ে বাইরেটা নিস্তব্ধ। বাড়িতে কিন্তু বেশ হট্টগোল। একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছি; আজ সকালে বাড়ি থেকে যাদের আসবার সব এসে পড়েছে। গুনে-গেঁথে একেবারে সকলে নয়, তবু ছোটয়-বড়য় একটি মন্দ দল হয় নি, তা নিয়ে বাড়ি সকাল থেকে বেশ সরগরম। কিন্তু এ যা চলছে বেশ একটু অন্যরকম, নিতান্ত ঝগড়া না বলা চললেও রীতিমতো কথাকাটাকাটি, আপসানি, সাক্ষী মানা। দয়া-মাসীমা

রয়েছেন বলে, আর আমি অনুপস্থিত বলে চলছেও বেশ উঁচু পর্দায়। কদমের গলাই বিশিষ্ট।

দু-একটা কথা যা কানে গেল, কৌতুক উদ্রিক্ত করে। প্যাকেটগুলা আফিস ঘরে রাখিয়ে দিয়ে আমি সুপর্ণা আর রজতকে পাশে নিয়ে দরজার বাইরে দাঁড়ালাম।

কদম বলছে—"আমি ঢের চেষ্টা করেছি কাকীমা—শেষ পর্যন্ত একটার পর একটা বাধা কাটিয়ে ঠিক করে এনেছিলুম, যেতেন কোথায় বাবাঠাকুর? তা ঠাকরুন-মাই যে উলটে গেলেন শেষের দিকে। নৈলে, ধম্মের কল বাতাসে নড়ে—সব পণ্ড হয়েও রতনদার কথা তো আপনিই বের হয়ে গিয়েছিল বাবাঠাকুরের মুখ দিয়ে—সেই ছুতোতেও যদি আরও খানিকটা সময় পেতাম···"

বুঝলাম, মধ্যস্থা হয়েছেন আমার ভ্রাতৃজায়া।

দয়া-মাসীমা বলছেন,—"হত তো খুবই ভালো, কিন্তু দেখলাম ঝক্কি নিতে চায় না; জোর করে চাপানো যায়? তুমিই বলো না বৌমা? এদিকে একটি সুপাত্রও যাচ্ছে পাওয়া; দেখলে তো ছেলেটিকে?"

কদম ঝেঁঝে উঠেছে—"অথচ অত তোড়জোড় করে ওঁকে নিয়ে এলাম প্রতাপপুর থেকে কাকীমা—রেগেও গেছলেন বাবাঠাকুর আমার ওপর প্রথমে—তা এই বলেই তো নিয়ে এসেছিলুম যে বাবাঠাকুরের হাতেই সমপ্পন করা হবে···"

সুপর্ণা পালাতে চায়, তার হাতটা চেপে ধরেছি।

বৌমা বলছেন—"ওঁর বয়েস হয়েছে তো বাছা, পঞ্চান্ন-ছাপ্পান্ন পেরিয়ে গেছে, সারা জীবনটা কাটিয়ে এখন কি আর এই বয়সে···"

ওঁর ওপরও ঝেঁঝেই উঠল কদম—"বয়েস! বয়েস! ঐ এক মুখের বুলি হয়েছে আপনাদের সবার। বেটাছেলের আবার বয়েসটা কি বলুন আমায়। কেন, ঠাকরুন-মাই তো তখন বলেছিলেন—আমি তো কিছু লুকিয়ে ছাপিয়ে রাখি নি, সে মেয়েই নয় আমি—তা এই উনিই তো তখন বলেছিলেন—পঞ্চান্ন-ষাট—সে আবার নাকি একটা বয়েস, পুরুষের পক্ষে?—পাত্র সত্তর পেরিয়ে গেছে—মেয়ে এদিকে তেরো, চোদ্দ, পনেরো—কত তো নিজের চোখেই দেখেছেন, বললেন। সেকালে তো এমন অনাচারও ছিল না, মেয়ে বড় হয়ে যাচ্ছে, কারুর

খেয়াল নেই···এই ঠাকরুন-মাই বলেছেন কাকীমা, জিগ্যেস করুন।···তা নয়, আসল কথা, এখন ছেলে দেখে লোভে পড়ে গেছেন—সে সব আর মনে নেই।"

বৌমা দুদিক রক্ষা করে (বোধ হয় ভাসুরের প্রতিও একটু করুণার ভাব রেখে) বলছেন—"তা নিতান্ত যে মন্দ বা বেমানান হত তা বলছিনে—সুপর্ণাও তো ডাগরটি হয়েছে দিব্যি। তবে এও বেশ ভালোই হয়েছে।··তা যদি বললি বাছা তো লোভ করবার মতন ছেলেটিও।"

রজতও ঘুরেছে, বললাম দাঁড়াও আর একটু··· প্রশংসা শুনে দর বাড়িও না। এদিকে সুপর্ণার হাতটা আরও চেপে ধরতে হয়েছে, বলছে—"উঃ, ছাড়ুন দাদু!"

হেসে ফেলে বলছে—"ছেড়ে দিয়ে আবার এমন করে চেপে ধরা!"

বাইরে বেরিয়ে এসে বারান্দায় দাঁড়ালাম। প্রশ্ন করলাম—"তোমরা ব্যাপারটা জানতে দুজনে?··নিশ্চয় জানতে।"

সুপর্ণা বলল—"জানব না কেন? বাড়ির বেড়ালটা পর্যন্ত জানত।"

বললাম—"বল নি কেন? আমার একটা এতবড় চান্স নষ্ট হল।"

সুপর্ণা বলল—"যে চোখ বুজে পথ চলে তার হয়ই নষ্ট দাদু।·· আর আমি গায়ে পড়ে বলতে গেলামই বা কেন?—বিয়ের কনে, তোমার কোন পক্ষপাতিত্ব নেই—ও হলেই বা মন্দ হত কি, আর (রজতের দিকে একটু চোখটা বেঁকিয়ে) এ যা হচ্ছে এই বা কি এমন ভালো?"

রজত হেসে মুখটা ঘুরিয়ে নিল।

শুভকাজ হয়ে গেছে। আমাকে ঘেরে এমন একটি পরিপূর্ণ সংসার—মায়ের স্থান নিয়ে রয়েছেন দয়া-মাসীমা, তারপর নাতনী; নাতজামাই, জীবনটাকে করে রেখেছে সরস; সেই রুক্ষ মরুময় প্রবাস-জীবন একটা দুঃস্বপ্নের মতো দূরে মিলিয়ে গেছে।

কন্যার স্থান নিয়ে রয়েছে কদম। আগেও ছিল, এখন আরও নিবিড় হয়ে উঠেছে। আরও স্নেহ করি বৈকি ওকে। যত ভুল করেই হোক, আমার ভালো করছে মনে করে যে নিজের মান-ইজ্জত পর্যন্ত দাঁড়ি-পাল্লায় তুলেছিল সে অসাধারণ-বৈকি। আমি আরও কৃতজ্ঞ ওর প্রতি। একদিন সন্ধ্যাতে চেষ্টা করেছি

ওকে, এখন ভয় হয়, ও যদি কোন দিন যেতে চায়, যদি আমার এই সর্বময়ী কন্যার স্থানটি শূন্য হয়ে পড়ে!

অন্য আশঙ্কাও হয় বৈকি, ও থেকে গেলে সে সম্ভাবনাটুকুও বরাবরের জন্য যে থেকে যায়।

কন্যা যদি তার বাপের বিবাহ দেওয়ার জন্য আবার কখনও উদ্যোগী হয়ে ওঠে!...এবার দৈবযোগেই গেলাম বেঁচে, এরপর আরও সূক্ষ্মতর প্ল্যান রচনা করে ওই যদি হয়ে বসে জয়ী!

সমাপ্ত